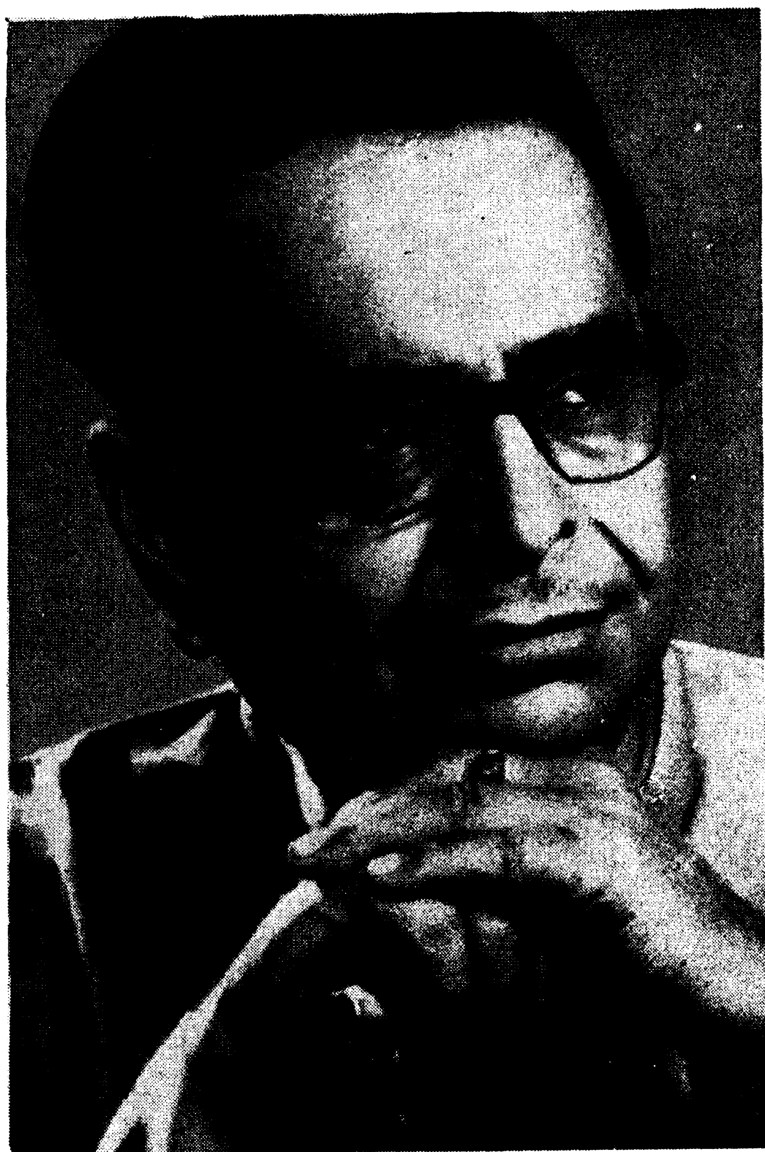
প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩৬৫

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সাহিত্যালোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে
প্রকাশিত এবং বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী হিরণ্যপ্রভা মিত্র
কল্যাণীয় শ্রীমান সুশীলকুমার সেন
করকমলে



জীবজগতের সাদৃশ্যে আমরা সাধারণত সাহিত্য সৃষ্টিকে দু-ভাগে ভাগ করে দেখি। জীবজগতে যেমন প্রাণী ও উদ্ভিদ, সাহিত্য সৃষ্টিতে তেমনি কবি ও অ-কবি (অর্থাৎ আখ্যাতা-ব্যাখ্যাতা)। আমাদের ধারণা যে, কবি লেখেন পদ্যে আর অ-কবি লেখেন গদ্যে। এ ধারণা ঠিক নয়। আমাদের সুদূর পূর্বপুরুষেরা জানতেন যে কবিরা গদ্যেও লেখেন। তাঁরা এও স্বীকার করে গেছেন গদ্য-পদ্য মেশানো রচনাও কাব্য বলে চলে, এমন কি তাঁরা নরম গোছের অনেক গদ্য রচনাকেও কাব্য বলে স্বীকার করতেন। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরবর্তী সাহিত্যস্রষ্টারা গদ্যেও কবিতা লিখেছেন ও লিখছেন। পদ্য ও গদ্যের স্টাইল ভিন্ন হলেও দুই ছাঁদেই যে ভাল কবিতা লেখা যায় সে বিষয়ে এখন আর কোন সংশয় নেই। এই পুস্তিকাটির বিষয় হল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ— যথাসম্ভব অল্প কথায় ও সহজবোধ্য করে বলাইবাবু কবি বলে পরিচিত নন। তিনি উপন্যাসকার, নাট্যকার ও গল্পলেখক (অর্থাৎ "গদ্য" লেখক) বলেই সকলে তাঁকে জানেন। (এখানে তাঁর চমৎকার ব্যঙ্গ কবিতাগুলির কথা ধরছি না।) কিন্তু বলাইবাবুর রচনায় কবিতার ভাগ মোটেই কম নয়। তাঁর কোন-কোন রচনায় গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কিছু পরিমাণে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য়। বলাইবাবুকে আমরা এখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ চম্পূ-লেখক, বলতে পারি। সুতরাং তাঁর 'বনফুল' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করা অসার্থক নয়। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে 'ফুল' আছে অর্থাৎ (কবিতা ও কাব্য) আছে, 'বন' অর্থাৎ উপবন— ফলপ্রসূ ও ছায়াবৃক্ষও আছে। তাঁকে আমরা আমগাছের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি আমের ফল সর্বজনগ্রাহ্য, আমের ফুল মধুকর ও কবিগণ জ্ঞাত।

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে বলাইবাবুর প্রধান বিশেষত্ব হল রচনায় বলিষ্ঠতার প্রকাশ। তাঁর বলিষ্ঠতা ছিল চিন্তায়, তাঁর বলিষ্ঠতা ছিল লেখায়। বলাইবাবু অনুকরণ করতেন না। সর্বদা অরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করতেন। অথচ তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র উৎকটতা ছিল না। কোন 'ইজম্' কোন রাজনৈতিক হুল্লোড় কোন ধর্মনৈতিক ধূলোট কোন কিছুর দিকেই তিনি নজর দিতেন না। প্রেসটিজ বাড়াবার জন্য তিনি বিলিতি লেখকের অনুকরণ করতেন না, তিনি বাংলায় ইংরেজি চালাতে কোন-রূপ চেষ্টা করেন নি। বলাইবাবুর পার্শোনালিটির ছাপ তাঁর ছোট বড় কোন রচনাতেই অনুপস্থিত নয়।

এই পুস্তিকার প্রধান অংশ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণরূপে পঠিত হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বনফুল স্মৃতি তহবিল (foundation) প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুকাল পরে একদিন আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মহাশয় টেলিফোনে জানান যে বনফুল স্মৃতি ফাউণ্ডেশনের প্রথম বক্তৃতা দেবার জন্যে আমার নাম উঠেছে। আমি কি নোব? বার্তাটি আমার কানে অদ্ভুত ঠেকল। কোথায় আমাকে নির্বাচন করে চিঠি দেবেন, তা না করে ফোনে জানতে চাইছেন আমি প্রস্তাব গ্রহণ করব কি না! আমি রেজিস্ট্রার মহাশয়কে বললুম, "আগে আমাকে চিঠি তো দিন, তার পরে বিবেচনা করে জানাব নোব কি নোবনা।" কিছুদিন পরে চিঠি এল, আমি ভাষণ দিতে রাজি হলুম। আমার রাজি হবার একমাত্র কারণ হল বলাইবাবুর রচনার প্রতি আমার অনুরাগ।

মাস দুই পরে লেখা শেষ হল। রেজিস্ট্রার মহাশয়কে জানালুম ভাষণ প্রস্তুত। তাঁরা সুবিধামতো দিন ঠিক করতে পারেন, তারপর সব চুপচাপ। মাস তিন চার পর হঠাৎ একদিন রেজিস্ট্রারের চিঠি এল দিন ঠিক করে। অন্তঃত দুটি লেকচার দিতে হবে দু দিনে। আমি রেজিস্ট্রারকে জানালুম, "বেশ আমি দুদিনই ভাষণ দেবো। তবে ভাষণ স্থান যেন

দোতলায় না হয়।" রেজিস্ট্রার উত্তর দিলেন একতলায় ভাষণ স্থান করা একান্তই অসম্ভব। আমি জবাব দিলুম, "দুদিন দোতলায় উঠে বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। দুটি বক্তৃতা যদি একদিনে সারতে দেন তবে আমি একদিন দোতলায় উঠতে পারি। নইলে ভাষণ দিতে পারব না।" আমাব কথায় রেজিস্ট্রার রাজি হলেন। দুদিনের কাজ আমি একদিনে সারলুম।

ভাষণটি যখন লিখি তখন আমার ধারণা ছিল যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এটি ছাপবেন এবং ভাষণ দেবার পরই তাঁরা পাণ্ডুলিপি নিয়ে নেবেন। তা তাঁরা কিছুই করেন নি। পাণ্ডুলিপিটি পড়েই ছিল নেপালবাবুর আগ্রহে এখন প্রকাশিত হল।

বলাইবাবুর সম্বন্ধে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। সে ভুল এখানে সংশোধন করছি। সে কথাটি এই যে তাঁব সৃজনী প্রতিভা সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর গভীর জগৎ ও জীবন দৃষ্টি যেমন তাঁর কলম হাকিয়ে ছিল তেমনি তাঁর তুলিও চালিয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি গল্প উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে ছবিও আঁকতেন। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল কিনা জানি না তবে তাঁর চিত্র রচনা তাঁর নিজস্ব কাজ, এ অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। বলাইচাঁদের চিত্রশিল্পের মূল্য নির্ধারণ চিত্র সমালোচকরাই করবেন। গ্রন্থ শেষে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হল।

ভূমিকা

স্রষ্টা সাহিত্যিক দুজাতের হয়। এক জাতকে বলা যায় গুটিপোকার দল, অপর জাতকে বলতে পারি বাবুই পাখির দল। দুটি জাতের প্রাণীই নিজের বাসা নিজে তৈরী করে। তবে বাসার ধরনে এবং নির্মাণে দুদলের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। গুটিপোকা নিজের দেহ থেকে সূতো বার করে তা দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করে রাখে এবং গৃহের মধ্যে বন্দী থাকে। খাবার খুঁজতে তাকে বাইরে যেতে হয় না। বাবুই পাখি কিন্তু যে গাছে থাকবে তার পাতা চিরে সরু দড়ি করে তা বুনে নিজের নিভৃত বাসা তৈরি করে, তবে নিজেকে একেবারে বন্দী রাখে না মাঝে মাঝে বাইরে উড়ে যায় খাদ্য সংগ্রহ করতে।

যে স্রষ্টা সাহিত্যিক গুটিপোকা জাতের তাঁর গানের যন্ত্র একতারা। তিনি সেই একতারাতে যে সব গান বাজান তা এক— একই সুরের না হলেও একই তানের। সেই ঐকতানের মাধুর্য্যের উপর তাঁর রচনার মূল্য নির্ভর করে। আর যে সাহিত্যিক বাবুই জাতের তাঁর রচনায় আর যে ত্রুটিই থাকুক না কেন তাতে একঘেয়েমি নেই। গুটিপোকা- সাহিত্যিক খোঁজেন ভাবের বৈচিত্র্য, বাবুই- সাহিত্যিক খোঁজেন বিষয়ের ভিন্নতা। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাবুই জাতের লেখক। তিনি কবিও ছিলেন। কবিতা বুঝতেন, কবিতা লিখতেন। তবে তাঁর চোখ ছিল সজাগ— বাইরের দিকে, অতন্দ্রিত ভাবে শুধু অন্তরের দিকে নয়।

বলাইবাবু কাহিনী লিখেছেন। দেখে-শুনে ভেবেচিন্তে যথাসাধ্য নতুনতর করে। তিনি পাঠক মোহন সিরিজ পাকাবার জন্যে ঢেরি ঘোরান নি। তাই বনফুলের রচনায় যে বিচিত্রতার সম্ভার পাই তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় পাই না।

বলাইচাঁদবাবু পাশ করা ডাক্তার ছিলেন, তবে ডাক্তারি করতেন না- ছুঁই ভাবে। তাঁর মন থাকত কলমের ডগায়। তাঁর আগেও একজন ভাল ডাক্তার-সাহিত্যিক জন্মেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর-ও বলাইবাবুর মতো সজাগ বাস্তব দৃষ্টি ছিল, যে দৃষ্টি তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। তিনি গরীব ভদ্র বাঙালী ঘরের ছবি আঁকতে পারেন নি কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে এবং তাঁর বাস্তব দৃষ্টি খুব ব্যাপক ছিল না। তার সাক্ষী দেবীচৌধুরাণীর প্রফুল্ল। একথা বলে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবে আঘাত হানছি না। তিনি যে স্থানে অধিষ্টিত আছেন সেখান থেকে কেউই তাকে নড়াতে পারবে না। তিনি বাংলা উপন্যাসের ব্রহ্মা।

বলাইবাবুর বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদা বাঙালী পাঠক দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। আমরা বাঙালী মনের পাকস্থলীতেও। রোগা মুখে মাছের ঝোল ভাতের মতো আমাদের মনের অভ্যাসও মসৃণ কাহিনী গল্প উপন্যাসে। বলাইবাবু একঘেঁয়ে মসৃণকাহিনী লেখেন নি। তাছাড়া তাঁর কাহিনীতে বুদ্ধি রসের যোগান আছে। বাঙালী পাঠকের ডিস্‌পেপ্‌টিক মানসে বুদ্ধিরস দুষ্প্রাচ্য। এইখানেই বলাইবাবুর বিশেষত্ব। আজ বাঙালী পাঠক বনফুলের গ্রন্থ উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের পাঠক তা করবে না। এই আমার ভবিষ্যৎবাণী।

গোড়ার কথা

সাহিত্যের কারবারে আমাদের দেশে সাহিত্যিকের প্রবেশিকা হয় কবিতা লিখে। কবিতা লিখে, কবিতার বই ছাপিয়ে তবেই এই কারবারে নিজের বিশেষ অধিকারটুকু খুঁজে নেন নবীন সাহিত্যিক। কেউ যান উপন্যাস গল্পে, কেউ যান নাট্য ও অন্যান্য রচনায়, কেউ রয়ে যান কবিতার ঘেরেই। আমাদের প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এই রীতি এখন পর্যন্ত চলে এসেছে। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়— যিনি বনফুল নামেই সাহিত্যজগতে শ্রুতকীর্তি— তিনি-ও নিয়মের বাইরে পা ফেলেন নি। তাঁর বনফুল এই তথল্লুসেই তার প্রমাণ রয়েছে।

বলাইবাবু যখন কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখনও তাঁর ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হতে বেশ দেরি ছিল। তিনি কবিতা লিখে পাঠাতেন প্রবাসীর মতো পত্রিকায়। প্রবাসী তখন দিগ্‌বিজয়ী পত্রিকা। সে সব পত্রিকা পড়ে বলাইবাবুর মতো অনেক ছাত্র সত্যকার সাহিত্যের শিক্ষা লাভ করতেন। কবিতা তিনি স্বনামে পাঠাতেন না। কেন? যেহেতু যেমন এখন তেমনি তখনও কবিতা পাস হত লেখকের নাম দেখে। যে লেখকের কবিতা কিছু কিছু ছাপা হয়েছে তার কবিতায় চোখ বুলিয়ে যদি নিন্দের কিছু না থাকে তবে তা ছাপিয়ে দেওয়াই ভালো। আর যাঁদের কবিতা ছাপা হয় নি সেই সব অজ্ঞাত নামা কবিতা-প্রেরকদের অজস্র কবিতা পড়ে তা বাছাই করে ছাপতে দেওয়ার কাজ অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও ফলহীন। সেই জন্যে ভালো মাসিক পত্রে অজ্ঞাতনামার কবিতা ছাপা হওয়া দামি লটারি পাওয়ার মতোই দৈবঘটনা ছিল।

কিন্তু ছদ্মনামে যে সব কবিতা পাঠানো হত তা সম্পাদক মশাইরা অমন সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। নানা কারণে তখন ছোট বড়ো এমন কি নামী লেখকেও কবিতায় ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

কেউ কেউ যে মনে, ওমর খয়্যামের অনুসরণে, কেউ বা আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে, আর কেউ বা নিজের অজ্ঞাত নাম ঢাকা দেবার জন্যে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে নাম দিতেন "নবকুমার কবিরত্ন"। দেবেন্দ্রনাথ সেন অনেক ছদ্মনাম ব্যবহার করে গেছেন। তাঁর দগ্ধকবু বেরিয়েছিল "মেঘনাদশত্রু" নামে। বেশি বয়সেও রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীর পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ছদ্মনামে। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'সমালোচনী' পত্রিকায় আমি এমন কবিতা দেখেছি "অপ্রকাশচন্দ্র ভাস্কর" ছদ্মনামে যা হঠাৎ পড়লে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে মনে হয়। পরে ভেবে দেখেছি ওই'কবিতাগুলি দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচনা হওয়াই সম্ভব।

যে মনোবৃত্তির বশে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রবাসীর দুর্গদ্বার অতিক্রম করতে "নীহারিকা দেবী" ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কতকটা সেই মনোভাব নিয়েই বলাইবাবু "বনফুল" ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। তবে অচিন্ত্যবাবুর মতে তিনি ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন নি। তিনি কবিতা লিখতেন সাধারণত প্রকৃতি বিষয়ে তাই "বনফুল" নাম অসঙ্গত হয় নি। এ বোধ তাঁর নিজেরও ছিল। তাই পরে যখন সাহিত্য কর্ম তার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলেছিল তখন ছদ্মনামটি পরিত্যাগ করবার চিন্তাও করেন নি। তাঁর গল্প-উপন্যাসে ও অন্য রচনায় বিষয়-বস্তুতে তিনি অন্বিষ্ঠ ছিলেন প্রকৃতিতে, বিশেষ করে মানব প্রকৃতিতে। তাই "বনফুল" নাম তাঁর যোগ্য সাধক-নাম। এই সঙ্গে প্রমথনাথ চৌধুরীর কথাও মনে পড়ে। তিনি ছদ্মনাম নিয়ে ছিলেন "বীরবল" ইচ্ছা করে। নামটির মধ্যে দুটি শব্দ লুকিয়ে আছে। দুটি শব্দের দুটি অর্থ। সে দুটিই তার পক্ষে খাটে। প্রথম শব্দ 'বীরবল' নাম, আকবরের বিদূষক বলে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় শব্দ 'বীর-বোল', মানে বীরের বাক্য, কঠোর বাণী। প্রমথবাবু সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন বীরের ছাঁদে, নামটিও তাই তাঁর "কাচ"-এর অন্তর্গত। বলাইবাবু সাহিত্যের ক্ষেতে ঢুকেছিলেন ভয়ে ভয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। তাই নামও নিয়েছিলেন তেমনি নিরহঙ্কার, নিরীহ।

বাংলা গদ্যে উপন্যস্ত[1] রচনা শুরু হল বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে। তার পর থেকে বলাইচাঁদের সময় পর্যন্ত একশ বছর কেটেছে। এই শতাব্দী-কাল মধ্যে বাংলা সাহিত্যের উপন্যস্ত শাখা বেড়েছে, পুষ্ট হয়েছে, উপশাখা বিস্তার করেছে। সেই উপশাখার একটি বনফুলের রচনা। বঙ্কিমের উপন্যাসের— কমেডি হোক, ট্রাজেডি হোক, ঐতিহাসিক হোক, ধর্মভাবাপন্ন হোক, নীতিসমাচ্ছন্ন হোক— প্রধান রস রোমান্স। এই জন্যে তাঁর রচনার বিষয় বস্তু কখনোই সম-সাময়িক নয়। দূরের থেকে দেখলে রোমন্সের চশমায় কোন দৃশ্যই অসঙ্গত ঠেকে না। বঙ্কিমের উপন্যস্ত রচনার এই ত্রুটি মোচন করে বাংলা উপন্যাসকে বাস্তব সন্নিকর্ষে এনে দিলেন তারকচন্দ্র। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই সমসাময়িক, কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব যখন মধ্যাহ্ন গগনে তখনই তারকচন্দ্রের 'স্বর্ণলতা'-র প্রভাব নবীন সাহিত্য স্রষ্টারা অনুভব করতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট রোমান্সের পথে অগ্রগামী লেখক রমেশচন্দ্র তাঁর শেষ দুটি উপন্যাসের বেলায় সে পথ ছেড়ে দিয়ে তারকচন্দ্রের পথ ধরে ছিলেন বললে অসঙ্গত হবে না তবে রমেশচন্দ্র 'সংসার' (১২৯৩) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) লেখবার অনেক আগেই তাঁর সমবয়সী শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বঙ্কিমের পথ এড়িয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় বাঙালী দরিদ্র ভদ্রসংসারের কোন ছবিই নেই। এ বিষয়ে যেটুকু চেষ্টা করেছিলেন তা রোমান্সের গ্যাসে স্ফীত হয়ে অবাস্তবতায় বিলীন হয়ে গেছে। মনে করুন 'দেবীচৌধুরাণী'-র প্রথম পরিচ্ছদের ঘটনা।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের প্লট খুঁজেছিলেন বিদেশী গল্পে, দেশী ঐতিহাসিক কাহিনীতে এবং নিজের অনুভবে ও কল্পনায়। যেমন করেছিলেন

---

১ ইংরেজী Fiction-এর কোন প্রতিশব্দ বাংলায় নেই 'উপন্যাস' শব্দটিকে চালানো যেতে পারত, কিন্তু তার মধ্যে 'গল্প'-কে পুরে দেওয়া চলে না। সেই কারণে কালিদাসের উক্তি থেকেই 'উপন্যস্ত' শব্দটি নিলুম। মানে, যার বস্তু সামনে এনে গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে সত্য বলে।

মাইকেল আরও প্রকট ভাবে। তারকচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন পর্যবেক্ষণের থেকে সমানুভূতির ছাঁকানিতে ছেঁকে নিয়ে। এই পথ অবলম্বন করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীও তার 'মেজ বউ' (১৮৮০) ও 'যুগান্তর' (১৮৮৫) উপন্যাসে। যে সংসারের কথা তিনি লিখেছেন সে সংসারের সন্তান তিনি। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন সে সংসার থেকে। বিচরণ করতেন অন্য সমাজে, তবে তাঁর সহানুভূতি ও সমবেদনা সজাগ থেকে তাঁর প্রতিভায় তৈল নিষেক করেছিল।

রমেশচন্দ্র ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তারকচন্দ্র ও শিবনাথ দুজনের লেখা থেকে। তবে একটি ইংরেজী উপন্যাস-জাতীয় রচনা বোধ হয় তাঁকে বেশি সজাগ করেছিল সমসাময়িক পল্লীজীবনের প্রতি। এ বইটি হল লালবিহারী দের Bengal Peasant Life বা Govinda Samanta (১৮৭৪)। এই বছরেই বই হয়ে বেরিয়েছিল তারকচন্দ্রের স্বর্ণলতা। বাংলা উপন্যস্ত রচনার বিবর্তনের ইতিহাসে বাঙালী লেখকের লেখা এই ইংরেজী পল্লীকথাটির সহায়তা কম নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হবার আগেই বাংলা উপন্যস্ত রচনায় যুগান্তর ঘটিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য ছোট গল্পের সৃষ্টি করে। উপন্যাসের রাস্তায় যেন কাঁটা গজিয়ে গেল। তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ছোট গল্পের খড়্‌তড়ি (escalator)। ছোট গল্পের সাপটে উপন্যাসের বহর খাটো হয়ে এল, বর্ণনার মশলার ভাগ কমে গেল, টানা ছবির দীর্ঘ পটের বদলে এল ফোটোগ্রাফের গুটকে (snapshot roll)।

দক্ষ ছোটগল্প লেখকের কলমে উপন্যাসের যে রূপ দাঁড়াল তার ভালো পরিচয় রয়েছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) 'নবীন সন্ন্যাসীর' (১৯১০-১১) মতো উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পকে যেন বঙ্কিমের উপন্যাসের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর বিশেষ মশলা হল ছেলে মানুষি সেন্টিমেন্টাল রোমান্স ভাবনা। সাধারণ পাঠক যাঁরা মন ভোলানো বিশ্রামসুখের আনন্দের জন্যেই উপন্যস্ত রচনা পড়ে থাকেন, তাঁদের চিত্ত হরণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র।

তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা খুব ব্যাপক ছিল না বটে কিন্তু খুব গভীর ছিল। শরৎচন্দ্রের কলমের জোর নির্ভর করেছে স্বানুভবের দৃঢ়তায়, যদিও সে স্বানুভব সর্বদা অকৃত্রিম নয়।

শরৎচন্দ্র উপন্যস্ত রচনায় বিষয়কে শুধু ঘরোয়া নয় অন্তঃপুর গত করে দিলেন যেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পে যে সব বিষয়ে হালকা আঙ্গুল ছুঁইয়ে গেছেন, শরৎচন্দ্র সেই সব বিষয়ের কোন কোনটিতে কলম দেগেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের দু-চার বছর আগে থেকেই বাঙালী সাহিত্যিকেরা কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন এবং কতকটা সেই ব্যপদেশেই ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের স্থূল তথ্যগুলি তাঁদের গোচরে আসছিল। (হাভিলক্ এলিসের **Psychology of Sex** বইটির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের 'ঘরেবাইরে'-তেই আছে।) 'ভারতী'-র নবীন গোষ্ঠী কিঞ্চিৎ sex-প্রবণতার দিকে ঝুঁকলেন, তবে তা কন্টিনেন্টাল ঔপন্যাসিকের পথে ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের পথে নয়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদেরই প্রশাখা গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশ প্রভৃতি কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের পন্থা আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করলেন। এঁরা নবীন সাহিত্যিকদের প্রথম বিশিষ্ট পত্রিকা চালু করলেন— 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'। গদ্যে পদ্যে এঁরা 'সবুজপত্র'-কে টেক্কা দিয়ে নবীনত্বের অঙ্কুর অঙ্কুশের মতো জাহির করতে লাগলেন। এই দলের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় নাম হল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৫)। আমাদের দেশের সমাজের ও সংসারের যে সব দৃশ্য রমণীয় নয় হৃদ্য নয় যার কোন তাৎপর্য নেই সুতরাং যা সাহিত্যের পটে ওঠেনি তাই ইনি আঁকতে লাগলেন নির্বিকার মধ্যস্থ অথচ সরল চিত্তে। রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ বাঙালী মানুষকে সর্বপ্রথম ঠাঁই দিয়েছিলেন সাহিত্যের সভায় কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সর্বত্রগামী হয় নি। তিনি কয়লাকুঠীর সাঁওতাল নরনারীর পরিচয় পান নি। বাঙালী উচ্চ ও নিম্নবিত্ত ভদ্র সংসারের কলকাতায়

মেস-বাসী পড়ুয়া ছাত্রের চাকুরে যুবকের ছবি এঁকে গেছেন কিন্তু নোংরা পাড়ায় জীর্ণ ভাঙা বাড়িতে ও বস্তিতে হতচ্ছাড়া ভবঘুরে বাঙালী সন্তানের কোন হদিস দেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের ত্রুটি সংশোধিত হল শৈলজানন্দের রচনায়। শৈলজানন্দের লেখায় কোন ধর্ম বা রাষ্ট্র ঘটিত মতামতের দিকে কোনই ঝোঁক নেই। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও sex-রক্তরাগবিহীন এবং সেই হেতু প্রায়ই অরমণীয় এবং অনেক সময় নিষ্ঠুর। বলতে পারি শৈলজানন্দের সাহিত্যদৃষ্টি মানুষের বিচিত্র জীবনচেষ্টাকে নিরপেক্ষ বাস্তব ভাবে দেখেছে। স্ন্যাপশট প্রধান রচনা হওয়ায় শৈলজানন্দের রচনা সবই হয় ছোট নয় বড়ো গল্প। তাঁর কোন রচনা উপন্যাসের আয়তন পায় নি। (তবে বিক্রয়ের সুবিধার জন্য প্রকাশক তাঁর অনেক গল্পের বই সূচীপত্র না দিয়ে এমনভাবে ছেপেছিলেন যাতে বইটির পাতা উলটে গেলে গল্পের বই বলে বোঝা না যায়।) শৈলজানন্দকে অনুসরণ করে ছিলেন দুজন লেখক। একজন জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৩-১৯৫৭)। কিন্তু এঁর দৃষ্টি ঠিক নিরপেক্ষ ছিল না। তাতে জীবনের প্রতি তিক্ততার প্রতিফলন বেশ ছিল। জগদীশচন্দ্রর কিছু উপন্যাস— অর্থাৎ বড়ো গল্পও লিখেছিলেন। তা তেমন ওৎরায় নি। একটির সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তা আপনাদের অনেকের নিশ্চয়ই জানা আছে। অপর ব্যক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথা পরে বলছি।

রোমান্স যথাসম্ভব ছেঁটে ফেলে ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান দৃষ্টিতে উপন্যস্ত রচনায় অগ্রগমন করলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)। কর্মসূত্রে উনি অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যাপক-রূপে। এর ছড়ানো বীজই অনতিবিলম্বে প্ররূঢ় হয়েছিল শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) ও বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) প্রচেষ্টায়। এঁরা বহু তরুণ কবি ও লেখকের গুরুস্থানীয়।

ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যস্ত রচনা ভূমিতে কয়েকজন জনপ্রিয় লেখিকা যশ লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের লেখায় শরৎচন্দ্রের ভাব

কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) শরৎ-চন্দ্রের স্নেহভাজন সাক্ষাৎ শিষ্যা ছিলেন। এঁর রচনার বিশিষ্টতা হল মেয়েলি স্নিগ্ধতা। শৈলবালা ঘোষজায়ার (১৮৯৪-১৯৭৭) রচনায় শরৎ-চন্দ্রের মৃদু সমাজ বিদ্রোহী ভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে (সেখ আন্দু ১৯১৫)।

অল্পকাল পরে এমনি দুজন শক্তিশালী লেখক দেখা দিলেন যাঁরা সমপন্থী হয়েও বিপরীতভাবুক। এক জনের স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘরের নাচ-দুয়ারে বিদায় যাত্রী স্নেহ পাত্রীর দিকে নিবদ্ধ। আর একজনের দৃষ্টি উদ্‌বেল হয়ে ওঠে ড্রয়িংরুমে বিদেশি ধরণে শিক্ষিত তরুণীর পিয়ানোর টুংটাঙে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ও শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু (জন্ম ১৮৯৭)— এঁরা দুজন ভিন্নমুখী বাংলা উপন্যস্ত রচনা আবার রোমান্‌সের দিকে ঘুরিয়ে আনলেন। বিভূতিভূষণের সাফল্য হল অনেক বেশি। তিনি শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া রোমান্‌সকে আরও ঘোরালো করলেন। বিভূতিভুষণের রচনার বিশেষ আকর্ষণ হল মনকেমনের হাওয়া (nostalgia)।

বাংলা উপন্যস্ত রচনার যখন এমন অবস্থা চলছে তখন কলম ধরেছিলেন বনফুল। তাঁর পরিপক্ক (mature) সাহিত্যকর্মে তিনি গোড়া থেকেই অনুকূলতা পেয়েছিলেন সজনীকান্ত দাসের কাছ থেকে।

সজনীকান্ত দাস শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ থেকে পঞ্চম দশকের গোড়া পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ভালো মন্দ বিচারের ভার নিয়ে ছিলেন যেন 'শনিবারের চিঠি'-র সাহায্যে। সজনীকান্ত প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন, গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর হাত ভালোই খেলত। কিন্তু নানা কারণে সাহিত্যকর্মে অনন্যমন হয়ে লেগে থাকতে পারেন নি। সম-সামসময়িক সাহিত্যের বিচারকের আসনে বসে তিনি নির্মমভাবে দণ্ড চালিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ "প্রগতিশীল" কবি ও উপন্যস্ত লেখকদের প্রতি। আর অনুকূলতা করেছিলেন ক্ষমতাশালী মাইকেল ও বঙ্কিম পন্থী গতানুগতিক কবি ও লেখকদের প্রতি।

স্বভাবতই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও প্রায়ই অনুকূল ছিলেন না। (শেষের দিকে এ ভাব পালটে গিয়েছিল।) ওদিকে আবার কিছু কিছু সম্ভাবনাময় নবীন লেখক তাঁর উৎসাহ পেয়ে সাহিত্যকার্যে সুনমতা লাভ করেছিলেন। কিছু দিনের জন্যে (১৩৩০-৩৪) সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্র চালিয়েছিলেন। এই পত্রিকায় তিনি যে সব নবীন লেখককে হস্তামর্ষ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬)। এঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' বঙ্গশ্রীতেই বার হয়েছিল। সজনীকান্তের পক্ষপুটাশ্রিত দ্বিতীয় বড়ো লেখক ছিলেন বনফুল। তবে এঁকে বিশেষ হস্তামর্ষ দেবার প্রয়োজন হয় নি। এঁর রচনা কখনোই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো (controversial) ছিল না। তবে এঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি ও প্রথম গদ্য রচনাগুলি শনিবারের চিঠিতেই প্রকাশিত হত।

বনফুলের পক্ষে সজনীকান্তের কলমের অনুকূলতা কখনোই পস্তৃত হয় নি। আমার মনে হয় ব্যাপারটা হয়ত সময়ে সময়ে একটু উলটো রকম ছিল। সজনীকান্ত ব্যঙ্গকবিতা লিখতেন। ঝাঁজ একটু বেশি কড়ার-কম হলেও বেশ উপভোগ্য। আমার মনে হয় এই কাজে বনফুল গুরুগিরি করে থাকবেন। বনফুলের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে সজনীকান্তই তাঁর বইয়ের প্রকাশক ছিলেন। পরে আর ছিলেন না। তবুও সজনী-কান্তের সঙ্গে বনফুলের সৌহার্দ্য চিরদিন অটুট ছিল। বন্ধুবাৎসল্য ছিল বনফুলের অসাধারণ গুণ।

বনফুল কলকাতার ও বাংলা দেশের বাইরে জন্মেছিলেন, মানুষ হয়েছিলেন এবং জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত ভাগলপুরে কাটিয়েছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাজারিবাগে যান ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে। সেখানে পাদ্রিদের কলেজে পড়ে তাঁর মনের পরিধি অনেকটা ছড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি ডাক্তারি পড়তে— তাঁর বাবা ডাক্তার ছিলেন, তাই তাঁর বড়ো ছেলে স্বাভাবিক ভাবেই সেই পথ ধরেছিলেন— কলকাতায় আসেন। এখানে বছর তিন চার পড়বার পর পাটনায়

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে পর বনফুল সেখানে চলে যান। (চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, ইচ্ছাসুখে যান নি। বনফুল বিহারের ছাত্র বলে কলকাতার মেডিকেল কলেজে নির্দিষ্ট ঠাঁই পেয়েছিলেন। বিহারে কলেজ স্থাপিত হওয়ায় কলকাতায় তাঁর নির্দিষ্ট স্থান আর রইল না, তাঁর স্থান হল পাটনায়। তাই তাঁকে পাটনায় ডাক্তারি বিদ্যার শেষ দু এক বছরের পাঠ নিতে হয়েছিল। কলকাতায় এই কয়েক বছরের স্থিতি তাঁর প্রতিভার বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূলতা করেছিল। এর আগে এমন বিচিত্র জনসংঘট্ট তিনি অনুভব করেননি, এমন বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শও লাভ করেন নি। কলকাতায় এসে, থেকে তাঁর যেন সাহিত্য প্রতিভার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হল। তাঁর ভাবুকতা কেটে গেল, তাঁর দৃষ্টি যেন মানুষের সংসারে খুলে গেল। বাস্তবের রস তাঁর চিত্তকে অভিষিক্ত করলে। এইখানে ও এইসময়েই সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল।

পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভাগলপুরে বসলেন ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে। ভাগলপুরে বসবার কারণ হল এই যে এই শহরের থেকে গঙ্গা পেরলেই তাঁদের বাসস্থান গ্রামে যাওয়া যায়। তাঁর পিতা দেশেই থাকতেন। ঠিক ডাক্তারি প্র্যাকটিস তাঁর করা চলল না। মন ধাওয়া করেছে সাহিত্যের পথে। সে পথের অনুকূল বাতাসও গায়ে লাগছে। তিনি কাজের সময়ের চেয়ে দীর্ঘতর না-কাজের অবসর চান। সমস্যা মেটানো গেল ব্যাকটিরিওলজিকাল লেবরেটরি খুলে। এতে একরকম ডাক্তারি করা চলল, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চার বিচ্ছেদও ঘটল না। উপরন্তু লেখবার যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল। সাহিত্য সাধনার পথ নির্বাধ হয়ে রইল। ডাক্তারির সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক রইল সেটুকু তাঁকে সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান যোগাতে লাগল। সমানের স্তরের ব্যক্তির সঙ্গে অন্যথা তাঁর এমন যোগাযোগ ঘটতে পারত না। বনফুল তাঁর রচনার টাটকা বিষয়বস্তু এই ভাবেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। আমাদের খুব কম সাহিত্যিকেরই এমন সুবিধা

সৌভাগ্য হয়েছিল।

বাংলা উপন্যস্ত রচনায় বলতে গেলে আড়াইজন শক্তিশালী ডাক্তার সাহিত্যিকের আর্বিভাব ঘটেছে। এঁদের মধ্যে যিনি প্রথম সেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী। তার উল্লেখ আগে করেছি। তাঁর অভিজ্ঞতা অনেকটা বনফুলেরই মতো। তবে তিনি সরকারি চাকরি করতেন। এখানে ওখানে ঘুরতে হত। বনফুল কিন্তু একঠাঁই থেকে গিয়ে বিচিত্র নরনারীর সম্পর্কে আসতে পেরেছিলেন। বনফুল হলেন আমাদের দ্বিতীয় বড়ো ডাক্তার সাহিত্যিক।

অর্ধ-ডাক্তার সাহিত্যিক ছিলেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। অদ্ভুত প্রতিভাবান, অদ্ভুত মানুষ। ভালো লিখতে পারতেন, ছবি আঁকাতেও হাত ছিল। (এঁরই এক ভাই বিখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।) চিত্তের দৃঢ়তা ছিল নিদারুণ। সেই কারণে সাহিত্যকর্মে কোমল ভাবে তুলি চালাতে পারেন নি। বনবিহারীর সম্পর্কে বনফুল এসেছিলেন জুনিয়ার শিক্ষকের কাছে সিনিয়ার ছাত্র রূপে। মনে হয় পিতার পরেই বনবিহারীর প্রভাব সব চেয়ে বেশি পড়েছিল বলাইচাঁদের চরিত্র গঠনে। পিতার উদারতা আর শিক্ষকের দৃঢ়তা বনফুলের রচনার বয়নে টানা পোড়েন গেঁথে আছে। একাধিক উপন্যস্ত কাহিনীর চরিত্রে বনবিহারীর প্রতিফলন হয়েছে। একটি উপন্যাসকল্প রচনা 'অগ্নীশ্বর'-এর নায়কই তো বনবিহারী।

বনফুলের নিজের চরিত্রে যে উদারতা ছিল তাতে যেন শরৎচন্দ্রীয় কাহিনীর নায়কের বেপরোয়া ভাব লক্ষিত হয়। এই বেপরোয়া ভাব দাম্ভিকতা নয়, বলা যায় অ-সাংসরিকতা, অ-সংকীর্ণতা। সমসাময়িক সাহিত্যে বনফুল প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের **(opposite camp)** বড়ো লেখক বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তুলনা করলে বনফুলের চরিত্রে এই খোলা-হাওয়া ভাবটার মূল্য নিরূপণ করতে পারি। বুদ্ধদেব তাঁর কলমের খোরাক আহরণ করতেন বইয়ের পাতা থেকে প্রধানত, আর বনফুল তা

সংগ্রহ করতেন চোখে দেখা মানুষ থেকে। বুদ্ধদেব নানা দেশ বেড়িয়েছেন, কিন্তু তিনি আসলে ছিলেন ঘরকুনো, যাকে ইরাজীতে বলে **introvert**। বনফুল ছিলেন তার বিপরীত। তিনি বড়ো কোথাও যেতেন না। (তাঁকে একবার সাহিত্য আকাদামির সদস্য করা হয়েছিল বর্ধমান সাহিত্য সভার প্রস্তাব ক্রমে, কিন্তু তিনি একটিও মিটিঙ করতে দিল্লীতে যান নি।) তিনি আপাত দৃষ্টিতে ঘরকুনো মনে হলেও তাঁর মনের চার খুঁট ফাঁক ছিল। বনফুল প্রথমে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, তার পর ডাক্তারি পড়েন। কিন্তু গোড়া থেকেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী-সুলভ জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি তাঁর ছিল। বিজ্ঞানদৃষ্টি তাঁর বিশিষ্ট রচনাগুলির মেরু-দণ্ডের কাজ করেছে বললে অন্যায় হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে কখনোই ঘোলাটে হতে দেন নি সমসাময়িক পাঠকদের ভোলাবার জন্যে। সমসাময়িক উপন্যস্ত রচনায় লেখকদের মধ্যে বনফুলই বোধ করি রবীন্দ্রনাথকে যথাসম্ভব পুরোপুরি বুঝতে পেরে ছিলেন। এই বিষয়ে, বয়সে এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বনফুলের মিল ছিল। শরদিন্দু কলকাতায় পড়েছিলেন। উকীল হয়েছিলেন। কিন্তু প্র্যাকটিস করেন নি। সোজা-সুজি লেখার জগতে চলে গিয়াছিলেন। তবে সে কাজে একটানা থাকতে পারে নি। শরদিন্দুবাবুর (১৮৯৯-১৯৭০) উপন্যস্ত রচনায় স্নিগ্ধতা ছিল কিছু বেশী। তিনি ছিলেন যেন প্রভাতকুমারের অনুযায়ী। তাঁর দৃষ্টি ছিল অতীতের দিকে এবং বর্তমানের জেরে। বনফুলের দৃষ্টি অতীত-অমোহিনী ছিল না তাঁর বর্তমানের উপর দৃষ্টিই ভূত ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করে থাকত।

মুঙ্গের ও ভাগলপুরের সাহিত্যিকদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ মিল ছিল তাঁদের উদারতায় ও ভদ্র ভাবনায় ও আচারে। সাহিত্যের সম্পর্কে-এ দুটি গুণের উপযোগিতা প্রাসঙ্গিক না হলেও দ্রুত অপস্রিয়মাণ সামাজিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গে পাঠকদের জানা আবশ্যক বলে মনে করি। এখন-কার দিনে লেখক আর পাঠকের মধ্যে আর সমভূমি দেখা যায় না।

অনেকটা যেন film-star আর fan সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেটা কোন পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয় "সহ নৌ অবতু সহ নৌ ভুনক্তু"— এ মন্ত্র লেখক-পাঠকদেরও সমান যোগমন্ত্র।

বনফুল ও শরবিন্দু গোড়ার দিকে সহকর্মী ছিলেন শনিবারের-চিঠির পৃষ্ঠায়। দুজনেই ওতে ব্যঙ্গ-কবিতা লিখতেন, অনেকটা একই রকম। তবে কেউই নিজের নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন না।

কবিতা

সমসাময়িক লেখদের সঙ্গে বনফুলের সাহিত্য প্রচেষ্টার একটা স্পষ্ট পার্থক্য ছিল। অন্য লেখকের মতো বনফুল একই ধাপে একই ধরণের বই লিখে যেতেন না তিনি রচনার ধাপ পালটাতেন। (এ বিষয়ে তাঁর কিছু মিল ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।) তাঁর উপন্যাস্ত রচনায় কত রকম ছাঁদ উপন্যাস বা বড়ো গল্পের মধ্যে তিনি নাটকের কৌশলও ঢুকিয়েছেন তাঁর রচনার বিশেষ আলোচনায় একথা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে।

বনফুলের কলমের প্রথম ফসল কবিতা; ছাত্রাবস্থায় এ কথা যেমন সত্য ডাক্তারি পাস করা সাবালক অবস্থায়ও তেমনি সত্য। শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত তাঁর গদ্য-পদ্য রচনাবলীর মধ্যে কবিতাগুলিই সতেজ ও সুস্পষ্ট। সাহিত্য তাঁর সুগঠিত ছিল, ভাষায় তাঁর ভালো দখল ছিল। ছন্দের কানও তাঁর সূক্ষ্ম ও নিপুণ ছিল। কবিতাগুলি প্রায় সবই হাসির। সে হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ আছে, বেদনা আছে কিন্তু কোথাও কাঁটা নেই। (দুটি একটি কবিতা ছাড়া। কিন্তু সেখানেও কাঁটা স্থূল নয়।) কবিতার বিষয় সমসামায়িক বাঙালী জীবনের ভণ্ডামি ও হতাশা। যেদিনে বনফুল কবিতাগুলি লিখেছিলেন সেদিন আমরা কবে পার হয়ে এসেছি কিন্তু তাতে বনফুলের কবিতার সমসাময়িক মূল্য হ্রাস পায় নি। অনেকগুলি কবিতা স্থায়ী সাহিত্য ঠাঁই পেয়েছে।

প্রথম কবিতার বই 'বনফুলের কবিতা' বেরিয়েছিল ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসে। প্রকাশিত হয়েছিল রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস থেকে। প্রকাশক ছিলেন শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। কবির মুখবন্ধটুকু এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

আমার কাব্যপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন বটুদা, প্রবোধদা, ডাঃ

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীপরিমল গোস্বামী। নিরুৎসাহ দ্বারা পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন অনেকে। তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে।

ইঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই অনশনের দেশে কবিতা প্রকাশের দুঃসাহসের জন্য সোদর-প্রতিম কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইতেছি।

"বনফুল"

ভগবান আছেন।

বইটি আকারে রবীন্দ্রনাথের পূরবীর মতো। কবিতা সংখ্যা তিরিশ। বিষয় বিচিত্র,— "গোরু" থেকে "নামানি"। গোরু কবিতাটি বোধ হয় সংকলনটির সব চেয়ে পুরোনো রচনা। প্রথম ও শেষ স্তবক,

মানুষ তোমায় বেজায় খাটায়,
টানায় তোমায় লাঙল গাড়ী,
একটু যদি দোষ করেছ
অমনি পড়ে লাঠির বাড়ি।...
তোমার পরেই এ অত্যাচার,
হে মরতের কল্পতরু,
কারণ? নই সিংহ কি বাঘ,
কারণ তুমি নেহাৎ গোরু!

দুটি একটি নিতান্ত ছোট কবিতা সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের মতোই সমুজ্জ্বল। যেমন "সাধারণতঃ",

প্রিয়া হ'ল প্রিয়তমা গহনার বেলা,
গাঁজার প্রসাদ-ক্ষণে ভক্ত হয় চেলা;
প্রিয়তম হয় বন্ধু হলে চাটুকার,
বিবাহের কালে পুত্র ভক্ত যে পিতার।

এই ধরনের কিন্তু আরও হাল্‌কা "সত্য ও মিথ্যা"। পাঁচটি ছোট স্তবকে মানুষের জীবন কথা।

শৈশবে রূপকথা চুপ করে শুনতাম,

মনে হত, ওর বুঝি সব খানি সত্যি ;
বড় হয়ে দেখলাম, ভাবলাম, বুঝলাম,
রঙকরা খালি শুধু মিথ্যেয় ভর্তি।
কৈশোরে যৌবনে কাব্য ও বিজ্ঞান
কত শত পড়লাম হয়ে উন্মত্ত ;
মনে হল, বিজ্ঞানে পাওয়া গেল ঠিক জ্ঞান,
কাব্যেতে বোঝা গেল হৃদয়ের তত্ত্ব !···
ঈশ্বর দয়াময়, করি তাঁর নামগান,
তাঁরি কথা অহরহ জাগে মোর চিত্তে,
মাঝে মাঝে ভয় হয়, দেখো যেন ভগবান,
তুমিও না শেষকালে হয়ে যাও মিথ্যে !

সমসাময়িক বাঙালী ছেলের মতি-অস্থিরতার হাসির ছবি উঠেছে "দরদ" কবিতাটিতে শুধু শব্দ তালিকার মালায়।

যাহারে বেসেছি ভালো, বাসিব রে কিম্বা
আম, আতা, আনারস, কুল, লিচু নিম বা
সয়গল, উমাশশী, ডগলাস্, ময়না
হিট্লার, হরিজন, গারবো বা গয়না
ভাটিয়া, ইহুদি, আগা, মাড়োয়রি, পার্শি
ভিটামিন, সেভিয়েট চশমা বা আরসি···
খাদি বা টুালে মুগা, অদ্ধি, গরদ গো
সকলেরই তরে মোর গভীর দরদ গো ;
কান ধরে উঠ-বোস্ করাইতে নিয়ত।
উদ্ধার যদি থাকে বাংলারে দিওত।

কয়েকটি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ঝঙ্কার স্বচ্ছ। যেমন, "বিবাহের ব্যাকরণ",

নববধূ এলেন বটে চেপে রূপোর পালকি
ঘরে কিন্তু নাই ঠিকানা খাবেন তিনি কালকি।

মেয়ের বাপের রক্ত শুষে বাজলো বটে বাদ্য,
ঘরে কিন্তু নাইকো রে হায় পেটে দেবার খাদ্য।
খাবেন কি তা ঠিক না হতেই এলেন একটি পুত্র,
সফল হল সংস্কৃতের অসাধারণ সূত্র।
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজল ঠনন্ ঠঞ্,
'বি' পূর্বক 'বহ' ধাতু— তার উত্তর ঘঞ্।...

অথবা যেমন "বিদগ্ধ",

লইয়া বিক্ষত পৃষ্ঠ বিমর্দিত শ্রবণ-যুগল,
ধারাপাত সিক্ত করি বিগলিত অশ্রু-ধারাপাতে
কত কিছু শিখিলাম। ইতিহাস, গণিত, ভূগোল।
সাহিত্য ও স্বাস্থ্য-পাঠ দণ্ডধারী পণ্ডিতের হাতে।...

অথবা যেমন "ওরে ও বাঙালী",

ওরে ও বাঙালী, ওরে ও কাঙালী, ওরে ওরে ভিক্ষুক,
পরের দুয়ারে হস্ত পাতিয়া আজো কিরে পাস্ সুখ!
কেরানীর জাতি বলে মারে লাথি উপহাস করে সবে
মানুষের মত যোগ দিবি কবে জীবনের উৎসবে।
সত্যিকারের মানুষ হায় রে সত্যি কি নাই দেশে
মনুষ্যত্ব বিকায়ে সবাই চাক্‌রিই চায় শেষে!
হায় রে কপাল হায়,
চাক্‌রি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায়।...

কতকগুলি কবিতায় বনফুল রবীন্দ্রনাথকে টেনে এনেছেন। "চিঠির ডাক" কবিতাটিতে ক্ষণিকার অনুরণন শুনি। বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা।

চিঠি লেখার লোক ত তোমার
আমি ছাড়া অনেক আছে;
এবং তুমি প্রায়ই চিঠি
লিখে থাকো তাদের কাছে।
তোমার চিঠির জবাব তাঁরা

ফেরৎ ডাকে দেন ত কই,
আমার একটু দেরী হলেই
তবে এত রাগ কেন, সই !···

"অপ্রস্তুত" কবিতাটিতে বনফুল যেন রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কই তিনি তো খেঁকী কুকুর, বুড়ো বলদ ও বেতো ঘোড়াকে তাঁর কবিতায় স্থান দেন নি।

করুণ স্বরে খেঁকী কুকুর কয়—
"ওগো কবি— ও মানুষের কবি,
ছন্দে একে নাও গো আমার ছবি,
দুদিন পরে মরব যবে ফুরিয়ে যাবে সবি !
আমার নিয়ে তোল গো সুর লয়।
—করুণ স্বরে খেঁকি কুকুর কয় !···

শেষ স্তবকে কবির জবাব,

কবি কহে লজ্জানত মুখে—
"অনেক দিনই আমার কবিতাকে
সপে দিচ্ছি কোকিল-জ্যোছনাকে,
ফুলের বনে কোন ফাগুনে প্রিয়ার আঁখি ফাঁকে
জীবন ভরা অনেক সুখে দুখে।"
—কবি কহে লজ্জানত মুখে।

বনফুলের আবেদন বৃথা হয় নি তার প্রমাণ ১৯৪৭ সালের ১লা পৌষে সকালে লেখা কবিতাটি (আরোগ্য কবিতা সংখ্যা ১৪)।

মহুয়ায় যে 'নাম্নী' গুচ্ছের নায়িকা-রত্নমালা কবিতাগুলি আছে তার অনুকরণে বনফুল লিখেছিলেন এক সংক্ষিপ্ত নায়ক-রত্নমালা— বাঙালী পুরুষের।

সে যেন সঞ্চিত ধন অদৃষ্ট যক্ষের !
পুত্র যেন তৃতীয়-পক্ষের
বৃদ্ধ বিধাতার।···

মাতৃবক্ষে সে দেশেতে বিশেষ করিয়া
স্নেহ দিয়াছেন বিধি ভরিয়া ভরিয়া ।
সে দেশের ভাই,
নাহি তারো কোন তুলনাই ।
সে দেশের নদীনদ সাপ ছুছুন্দর
সমস্ত সুন্দর ।
তা লয়ে' কোরাস' ধরি উদ্বেলিত হৃদয়ে উদ্বাহু
ভগ্ন-কণ্ঠ হল কত শর্মা, সেন, সাহু ।···
বিচিত্র সাধনা ;
লক্ষীরে কামনা করে ভারতীর করি' আরাধনা,
ভারতীয় অপরূপা, সাদসিধা নহে বীণাপাণি,
নহে তা কমল-বন-বাণী ।
হস্তে নাহি বীণা ;
ছিন্নমস্তা মূর্তি তার— মাথামুণ্ড হীনা ।···
নাহি তার মহিমার সীমা
মনে তাহা যে-কোন সীমা ।
'মেকলে' পারেনি তাহা কিছুতে কমাতে,
মিস্ মেয়ো পারেনি দমাতে !···
অন্তরে ঐশ্বর্য তার— বাহিরে সে যদিও কাঙালী ।
নাম কি বাঙালী ?

তার পর কেরাণী, দালাল, ডাক্তার, উকিল ও তরুণ। তরুণের বেলায় ঝাঁঝ একটু যেন বেশি ।

দেহ তার কিছুতেই হল না সবল,
লম্বাচুল, জুলফি, গোঁফ, ব্যর্থ সকল !
ফ্রয়েডি মুখস্থ বুলি হল অনর্থক
ভেজেনা তাহাতে চিপিটক ।
পিঁচুটির মত তাই আছে লাগিয়া সদাই ।

কিছুতে না দমে'
বার বার পুছে ফেলে— পুন এসে জমে,
যৌবনের 'প্যারডি' সে, অথচ করুণ,
নাম কি তরুণ ?

দুটি কবিতায় সমসামায়িক দুজন লেখিকার প্রতি কটাক্ষ আছে। একজন বনফুলের মতোই বিহার বাসিনী। এর উল্লেখ আছে "অ-কবিতা"-য়।

...মালপোয়া খাওয়া কিন্তু ভারি নিরাপদ,
উচাটন করেও সে রসিকের হিয়া।
বীরভূমী ব্যাঙটাও পান্‌সি বাহিয়া
খেতে পারে, আহা, তাহা দুমকায় গিয়া!
কাঁটা নাই, কিছু নাই, খালি খেয়ে যাও!
—তাই কি ইলিশ ফেলে, ভাই, বিহারেতে
সুরসিকা রমনীও সব জেনে শুনে,
পানতোয়া ভালবাসে ছাতু দিয়ে খেতে ?

এক প্রতিষ্ঠিত লেখিকা নাম ভাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নাতনি সম্পর্ক পাতিয়ে কবিতা-পত্রাবলী বিনিময়ে নেমেছিলেন। একে উদ্দেশ করে লেখা হল "সেকালিনী"।

চৈত্র মাসেতে হায় প্রবাসীর পাতাতে
শ্রীমতী অপরাজিতা নানা ছুতা-নাতাতে
কবিগুরু রবিদা'কে হাত-মুখ নাড়াইয়া
দেখিতেছি ফেলেছেন একবারে পাড়িয়া!
যদিও বয়স তাঁর সত্তর পারায়ে
বুদ্ধিটা একেবারে যায় নি তো হারায়ে।
নাৎনীর কাছে তাই নানা রসে রসিয়া
হার মেনে কর-জোড়ে পড়েছেন বসিয়া।
'শিভাল্‌রি' একে যদি নাহি পার বলিতে,

বলিও না। —সব কিছু হতে পারে কলিতে।

কিন্তু শ্রীমতী তুমি ভাবিও না তা'বলে
ভুলাইবে আমারেও আবোলে বা তাবোলে,
আমার বয়স আজও তিরিশের কোঠাতে
স্বরু করিয়াছি সবে কিঞ্চিৎ মোটাতে !
বুদ্ধিও হয়ত বা নয় খুব তীক্ষ্ণ,
তবুও বুঝিতে এটা হয়নি তো বিঘ্ন—
এ-কালিনী নহ নহ, তুমি সেকালিনী গো
স্বামী সহধর্মিনী, তনয়-পালিনী গো।···

তার পর এ-কালিনীদের কার্যকলাপের ফিরিস্তি দিয়ে বনফুল সেকালিনীর পক্ষে রায় দিয়েছেন।

এ-কালিনী রমনীরে সিনেমা বা নাটকে,
যুদ্ধের শিবিরে বা রাশিয়ার ফাটকে
দেখিয়া তৃপ্ত হব,— দিব হাত তালিও ;
ঘরেতে কিন্তু চাই সেই পুরাকালীয়
রাগে অনুরাগে ভরা অঙ্গন-লক্ষ্মী
আধুনিক ডিম্বেতে সনাতন পক্ষী।
সুতরাং এই তব অতীত-প্রশস্তি
আনিয়া দিয়াছে মনে শান্তি ও স্বস্তি ;
খুসি আছি এই ভেবে আমাদের দেশেতে
দিদিমারা বেঁচে আছে নাৎনীর বেশেতে।

কয়েকটি কবিতা যেন খুব ছোট গল্পের মত। যেমন, "ভাদুড়ী", "অবিনাশ", "অন্নদা সরকার" ইত্যাদি। বনফুলের লেখার গুণে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ ঢাকা পড়ে গিয়ে কবিতাগুলিকে সমসাময়িকতার উর্দ্ধে তুলে দিয়েছে। তবুও বুঝতে কষ্ট হয় না যে অবিনাশ আর কেউ নয় জীবনানন্দ দাশ।

নেবুতলা লেন,
সেথাকার বনলতা সেন
লিখেছেন,
"হে দেবতা, আশাপথ চেয়ে তব, চিত্ত যে উতলা,
তুমি মম পরাণ পুতলা
বহু জনমের!
তোমারে চিনেছি আমি,— সয়েছিও ঢের।···

"ট্রাজেডি বৃক্ষের আর একটি ফল" কবিতার বিষয় একটি বিদেশী গল্পের আধারে গড়া। "রূপান্তর" কবিতায় ব্যঙ্গবাণ তীক্ষ্ণ।

···অদ্ভুত এ রূপান্তর!
যার ফলে ঊষর প্রান্তর
হয়ে ওঠে শ্যামময়ী কানন-বীথিকা
সঙ্গীত হইয়া যায় রেকর্ড-গীতিকা।
চিকিৎসক হইয়া পড়ে ঔষধ-বিক্রেতা,
বৈরাগী সে হয় দেশ নেতা।
আলটা ভায়োলেট রশ্মি দীপ্ত রবীন্দ্রের
ভাইটামিন রূপে হায় কত কবিদের
কল্পনারে মোটা করে।
আর তার ভরে
পটাপট ছিঁড়ে যায় তার
বাণীর বীণার!
স্থূলাঙ্গিনী সে কল্পনা চিৎ হন শেষে
মাসিকের পাতে পাতে চিৎপুরী বেশে।

মহাভারতের বিদুর চরিত্র ও বাংলা দেশে চলিত পুরাণ-কথা বিদুরের খুদ গল্পটি অবলম্বন করে "মার্জার মূষিক ইত্যাদি কথা" শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি লেখা। রচনায় বনফুলের সরস ভঙ্গির এক সরল প্রকাশ দেখা যায়। আরম্ভ এই রকম,

বিদুরের খুদ ইঁদুরে খেয়েছে, তারি সন্ধানে পার্থ
গাণ্ডীব নিয়ে গর্তে ঢুকেছে বাহির হয় না আর তো।
রন্ধনালয়ে একথা শুনিয়া ফেলিয়া হাতের খুনতি
আকুল নয়নে বাহিরে এলেন পার্থ-জননী কুন্তী।

কাগজে কিন্তু খবর বেরুল যে বিদুর অর্জুনকে গর্তে ঢুকতে দেন নি, শুধু ধৈর্য ধরে থাকতে বলেছেন। কিন্তু বিদুরের বিপদে সব দেশের লোক উত্তেজিত হয়ে প্রতিকারের জন্য বিড়াল পাঠাতে লাগল। হস্তিনায় তারা দুধ খেয়ে ইঁদুর ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। তার পর যখন তারা গর্তের দিকে গেল তখন তাদের বাধা দিলেন ভীমসেন।

স্বপ্ন ভাষে কহিলেন তিনি,—
"হে বন্ধু, সবারে আমি চিনি'
সুতরাং অনধিক বাক্য-ব্যয় করি,
সিধা পড় সরি'।"

গোঙারের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা জেনে বিড়ালেরা চলে গেল প্রোটেস্ট মীটিং করতে। এদিকে পার্থ গর্তে ঢুকে দেখেন সেখানে একটিও ইঁদুর নেই, এক কণাও খুদ নেই। ব্যাপার কি খোঁজ করে অর্জুন শুনলে ছুঁচোর কাছে যে ইঁদুর সব গ্রাস করেছে সাপেরা। অর্জুন ঠিক করলেন এত উদ্যম করে এসে শুধু হাতে ফেরা যায় না। সাপই মারতে হবে। কিন্তু সাপ কোথায়? খোঁজ করে জানা গেল যে সাপ সব গেছে গরুড়ের পেটে। সুতরাং গরুড়কে ধরতে হয়। এদিকে গরুড় হলেন বিষ্ণু-কৃষ্ণের বাহন! অর্জুন গেলেন বিষ্ণু-কৃষ্ণের কাছে গরুড়কে ধরবার জন্য। গরুড়কে ছাড়া বিষ্ণু-কৃষ্ণের চলে না। তিনি বললেন, গরুড়কে ছেড়ে দাও। চল যাই হস্তিনাপুরের বিদুরের সঙ্গে মিটমাট করতে। যথা সময়ে হস্তিনাপুরের ময়দানে মীটিং ডাকা হল। সভাপতি বিষ্ণু-কৃষ্ণ। মীটিং সুরু হবার সময়ে বিদুর দূত পাঠিয়ে জানালেন যে তিনি সভায় কিছু কথা নিবেদন করতে চান। সকলেই বললেন, বেশ, বেশ। বিদুর এসে বললেন,

"হে কেশব, রক্ষা কর মোরে,
উপকার করিও না আর দয়া করে',
উপকারী-সঙ্ঘ হতে মোরে কর ত্রাণ,
আজীবন গেয়ে যাব তব জয় গান।"

একটু বলেই বিদুর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল।

তখন হইল ঠিক— চলুক কীর্তন
অনুক্ষণ—
মূর্ছিত এ বিদুরে ঘিরিয়া
ঘুরিয়া ফিরিয়া।
—জমিয়াছে বহুবিধ পাপ
হয়ে যাক সাফ!

দেশের সাংস্কৃতিক ও পোলিটিক্যাল দধিকর্দমের এ এক চমৎকার সিম্বলিক প্যারডি চিত্র।

কিঞ্চিৎ স্থূল হলেও "শালা" কবিতাটি বনফুলের প্যারডি রচনার একটি ভালো নমুনা। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' অনুসৃত। আরম্ভ,

সামান্য মনুষ্য নহ, নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা,
হে শ্যালক, হে স্বভাব-শালা।
বঙ্গদেশে বহু বেশে বহু বার দেখছি তোমারে
রচিয়াছি তব জয়-মালা॥

তার পর বন্দনা গেয়েছেন পোলিটিক্যাল বাগ্মী,

সভামঞ্চে নেতৃবেশে, হে শ্যালক, সৌম্যদরশন,
প্রাণের আবেগে যবে বক্তৃতা করেছ বরষণ···
কর্ণ-দুটি করিয়াছ কালা।
হে শ্যালক, হে স্বদেশী শালা॥

তার পর বন্দিত হয়েছে ধর্মের পাণ্ডারা,

কখনও শ্মশ্রু-গুম্ফে আবরিয়া ও চাঁদ-বদন

জটা-মৌলি গুরু-বেশে অঙ্গে দেখ গৈরিক বসন,···
আত্মার অঙ্গুষ্ঠ রূপ, গীতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান-বচন,
বিতরিছ উপদেশ-মালা,
হে শ্যালক, হে ধার্মিক শালা ॥
তার পর বিচিত্র আর্টিষ্ট-বন্দনা,
কুর্দনে নর্তনে লাস্যে লক্ষ জনে লাগাইয়া তাক
কখনো সিনেমা-পটে, হে রসিক, সভঙ্গী সবাক
গুণ্ডা-বেশে কবি-বেশে, কাঁপাইছ সেই চোখ নাক
একই ছাঁচে ঢালা।
পিতৃধন ধ্বংস করি' ছাত্র ছাত্রী দেখিছে অবাক,
নাবালকে ভাঙিতেছে তালা,
হে শ্যালক, হে আর্টিষ্ট শালা ॥
তার পর পটুয়া-বন্দনা,
···কণ্ডুয়ন-উন্মাদনা আন্দোলিয়া তুলিতে অঙ্গুলে
আঁকিছে নিতম্ব-স্তন-মালা।
হে শ্যালক, হে পটুয়া শালা ॥
তার পর বন্দনা বাস্তববাদী সাহিত্যিকের,
নির্লিপ্ত উদোর-র পিণ্ড গিলাইয়া সন্ত্রস্ত বুধোরে

* * *

কোটর-প্রবিষ্ট আঁখি, গামছা-বাঁধা ক্ষুদার উদরে,
রসনায় লালা!
কন্টিনেণ্টালি ঢঙে ডাক দাও কামারে, ছুতোরে,
বক্ষে চাপি ধর বস্তি-চালা!
হে শ্যালক, হে বাস্তব শালা ॥
তার পর উকিল, দালাল, ডাক্তার, বাড়ীওলা ইত্যাদি পরম বকেরা,
কখনও উকিল বেশ।···
কখনও দালাল তুমি, কখনও বা মহাচিকিৎসক

কভু বাড়ীয়ালা,
কংগ্রেসে, মন্দিরে, মঠে, সর্বঘটে হে পরম বক
নানা পুষ্পে ভরিতেছ ডালা।
হে শ্যালক, হে শিকারী শালা॥

তার পর নায়কের পালা,
অনবদ্য তব কণ্ঠ কভু শুনি বিচিত্র ভঙ্গীতে
বেতারে, বৈঠকে, মাঠে, সভাস্থলে, রেকর্ড-সঙ্গীতে ;
কর্ণের পটহ ভেদী' ধৈর্যসীমা চাহে যে লঙ্ঘিতে,
প্রাণ ঝালাপালা।...
হে শ্যালক, হে ওস্তাদ শালা॥

তার পর খাঁটি শালার কথা,
হে মোর আসল শালা, হে প্রাকৃত, নির্জলা, নির্ঘাৎ...
ভাবিলেই তব কথা শিরে রক্ত চড়ে অকস্মাৎ,
অঙ্গে ধরে জ্বালা,
জুতা-হস্তে ছুটে যাই ; —কাছে গেলে শিথিল সে হাত,
মুখে তব মধু হাঁসি ঢালা।
হে শ্যালক, হে আসত শালা॥

তার পর জন নেতার বন্দনা,
দেশের দশের অর্থ শত হস্তে করিয়া লুণ্ঠন,
ভব্যতারে নগ্ন করি' সভ্যতার খুলিয়া গুণ্ঠন,
কভু হাস, কভু কাঁদ, কভু তব মৃদুল কুন্থন
একার্থ সুরে ঢালা
"অর্থ চাই, অর্ঘ্য চাই, বৃদ্ধি চাই, ওহে জনগণ,
তৃপ্তি নাই, আনো ছালা ছালা!"
হে শ্যালক, হে কৌশলী শালা॥

সব শেষে বিশ্বশ্যালক বন্দনা,
অপরিচয়ের মাঝে থাকো তুমি অ-শ্যালক বেশে,

ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা মূর্তি বাহিরায় এসে ।
আত্ম-বন্ধু-পরিজন কাছে গিয়ে দেখি, হায় শেষে
শালা— সব শালা ।
দিন যায় ক্রমে দেখি শালা-সাগরেতে এসে মেসে
ছুনিয়ার যত নদী নালা—
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা ॥

এই কবিতাটির মধ্যে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তির আদল মিলবে।

অতঃপর বনফুল গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তবে পদ্য রচনা ছেড়ে দেন নি। অতঃপর তিনি চার পাঁচ খানি কবিতার বই প্রকাশ করেছিলেন— 'অঙ্গারপর্ণী' (১৯৪০), 'চতুর্দশী' (১৯৪০), 'আহ্বনীয়' (১৩৫০) 'করকমলেষু' (১৩৫১) ইত্যাদি। ব্যঙ্গকবিতার সংখ্যা খুব কমে আসে। সে সব কবিতার ঝাঁঝও অনেকটা মন্দীভূত।

কয়েকটি উপন্যাসেও বনফুল প্রচুর কবিতা সংশ্লিষ্ট করেছেন। 'মৃগয়া' বইটির এক অংশ গদ্য কবিতায় লেখা। 'ডানা' বইটিতে পাখির উপর অজস্র কবিতা আছে। সেগুলিতে বনফুল বিশেষত্ব দেখিয়েছেন।

ছন্দোনির্মাণে বনফুলকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরেই স্থান দিতে হয়।

নাটক

গ্রন্থসংখ্যা বিচার করলে বনফুলের নাট্যরচনা কবিতাগ্রন্থের তুলনায় গরিষ্ঠ। তিনি এই নাট্য গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন,— 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৯৩৮), 'রূপান্তর' (১৯৩৮), 'বন্ধনমোচন' (১৯৪৮), 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯), 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪০), 'দশভাণ ও আরও কয়েকটি' ('৯৪৩), 'মধ্যবিত্ত' (১৯৪৩), 'সিনেমার গল্প' (১৯৪৬), দ্বৈরথের চিত্রনাট্য রূপ, 'বন্ধন মোচন', 'কঞ্চি' (১৯৪৬)।

নাট্য রচনায় বনফুলের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাঁর ভাব দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং ফোটগ্রাফিক তাই বর্ণনাও ছিল উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ এবং যাকে ইংরাজিতে বলে snappy। এরকম লেখকের ষ্টাইলের বিশিষ্ট গুণ চিত্রময়তা। সাধারণ উপন্যস্ত লেখকদের রচনায় যে ভাবুকতা চিত্রগুলিকে দীর্ঘসূত্রে বেধে যায় তা বনফুলের রচনায় নেই বললেই হয়। প্রধানত এই কারণেই বনফুলের রচিত কাহিনী অবলম্বনে তোলা ছায়াচিত্রগুলি অত সহজে জনপ্রিয় হতে পেরে ছিল।

বনফুলের কাহিনী গল্পরূপে ও নাট্যরূপে যে কতটা কাছাকাছি হতে পারে তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে 'দ্বৈরথ' আর 'সিনেমার গল্প' তুলনা করলে। অশেষ পরিবর্তন সত্ত্বেও রচনা দুটির মধ্যে স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও গভীর মিল আছে।

'সিনেমার গল্প'এর ভূমিকায় লেখক রচনাটির যে ইতিহাস দিয়েছেন তা কৌতুকাবহ। এতে সমসাময়িক সিনেমা টেক্‌নিকের সম্বন্ধে বনফুলের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করছি। বলে রাখি রচনাটি ফরমাস মাফিক লেখা হলেও শেষ পর্যন্ত সিনেমা-কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায় নি।

উপক্রমণিকায় লিখেছেন,

অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে ছিলাম।

সহসা একটি সিনেমা কোম্পানির বিখ্যাত একজন প্রযোজক আসিয়া দর্শন দিলেন।···

"আপনার 'দ্বৈরথ' বইটা আমরা নেব ভাবছি।···"

বলা বাহুল্য পুলকিত হইয়া উঠিলাম।···

"কিন্তু বইটায় কিছু অদল বদল করতে হবে।"

"ও! কি ধরণের অদল বদল?"

"আপনার দ্বৈরথ গল্পটা বিয়োগান্ত। ওটাকে মিলনান্ত করতে হবে। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিলের পক্ষপাতী।···

"তা হলে দ্বৈরথটা নিচ্ছেন কেন?···"

"না। 'দ্বৈরথ'টাই চাই। 'কুনকী'র ভাল লেগেছে।"

"কুনকী? সে আবার কে?"

"আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটারের পেট অ্যাক্‌ট্রেস। হিরোইনের পার্টটা সেই করতে চায়। তার মতো করে লিখেও দিতে হবে পার্টটা আপনাকে।··· ওসব বঙ্কিকুমারী টুমারী চলবে না। কলেজে পড়া আপটুডেট স্মার্ট মেয়ে করতে হবে। একটু কমিউনিষ্ট গোছের করলে আরও ভাল হয়। আনম্যারেড তো করতেই হবে।"

"কমিউনিষ্ট গোছের মানে?" শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম।

"মানে গৃহলক্ষ্মী প্যাটার্ন নয়। দৌড়ধাপ পরোপকার, সভা-সমিতি— এই সব আর কি। সমাজের হিতার্থে, জীবন উৎসর্গ, ঝকমকে গয়না আর চকচকে শাড়ি পরে বস্তিতে ঘুরে বেড়ানো— এই সব পাঁচ রকম লাগিয়ে দেবেন। গোড়ায় গোড়ায় তার ভাবটা হবে যেন সে আজীবন কুমারী থেকে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে ঠিক করেছে— শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রেমে পড়িয়ে দিতে হবে— তা না হ'লে বুঝলেন···

বুঝিতেই হইল, অর্থাভাবে পড়িয়াছিলাম।

উপসংহারে লিখেছেন,

মাস দুই পরে পাণ্ডুলিপি ফেরত পাইলাম। পাণ্ডুলিপির সহিত প্রযোজক মহাশয় একটি পত্রও লিখিয়াছিলেন। প্রথমাংশ এইরূপ—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

অতিশয় দুঃখের সহিত সিনেমার গল্পের পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠাইতেছি। ছায়া-জগতে যাহাকে রূপায়িত করিবার জন্য ম্যানেজিং ডিরেকটার এই গল্পটি লিখিয়া ছিলেন সেই কুনকীই সরিয়াছে। সোহাগার ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে এমন অভিনেত্রীও বর্তমানে আমাদের নাই। আজকাল যিনি ম্যানেজিং ডিরেকটারের পেট অ্যাক্‌ট্রেস তিনি নৃত্যগীত পটিয়সী··· মাইফেল্ল-মোহিনী। বহ্নিকুমারীকে সোহাগা করিয়াছেন, সোহাগাকে যদি বাইজিতে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে হয়তো বইখানা আমরা 'প্রডিউস' করিতে পারি। করা কি একেবারেই অসম্ভব। ভাবিয়া দেখিবেন।······

নাট্যরচনায় বনফুলের সাফল্যের সব চেয়ে বড়ো পরিচয় রয়েছে তাঁর দুই বইয়ে। 'শ্রীমধুসূদন' আর 'বিদ্যাসাগর' লিখে তিনি প্রায়-সমসাময়িক মহৎ ব্যক্তির জীবনকথা নিয়ে রঙ্গমঞ্চের নৈবেদ্য সাজাবার পথ দেখিয়ে দিলেন বাংলা ভাষায়। এর আগে যে জীবনী নাট্য ছিল না তা নয় সবই ধর্মনেতা, ও বীর পুরুষদের নিয়ে লেখা এবং তা অল্প-বিস্তর ঐতিহাসিক দূরত্বব্যবহিত।

মধুসূদনের চরিত্রে নাটকীয়তার অভাব নেই। তাই ওই বইটির জন্য লেখককে খুব প্রয়াস করতে হয় নি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বেলায় সে সুবিধা ছিল না। তাঁর চরিত্রে যে নাটকীয়তা ছিল তা দুর্লক্ষ্য। সে নাটকীয়তা পরিস্ফুট করে বনফুল বিদ্যাসাগর বইটিতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ডাক্তারি পাস করে (১৯২৭) আবার কলকাতায় এসে হাউস সার্জনি করবার সময়ে বনফুল ডাক্তার চারুব্রত রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং সম্ভত তাঁর মার্ফত ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে সাহিত্য রচনায় নিজের প্রকৃত প্রবণতার পথটি খুঁজে পান। সম্ভবত বনবিহারীর সূত্রেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে, এবং সেই সূত্রে সজনীকান্ত ও শনিবারের-চিঠির গোষ্টীর সঙ্গে। হাউস সার্জন গিরি শেষ হলে সেই বছরেই তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে যান। সেই কারণে তখন শনিবারের-চিঠির গোষ্টীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনোই হয় নি। সজনীকান্তের সঙ্গে পরিচয় হয় সম্ভবত প্রবাসীতে লেখা ছাপতে দেবার সূত্রেই।

তুচার মাস বিহারে এখানে ওখানে কাজ করে বনফুল আজিমগঞ্জের হাসপাতালে কাজ নেন। একাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৯২৯ সালের পুজার পরে ভাগলপুরে ডাক্তারি করতে শুরু করেন। সেই কাজ চালিয়ে এসেছিলেন প্রায় শেষ পর্যন্ত। সে কাজ ছেড়ে দেন তিনি ভাগলপুর বাস পরিত্যাগ করবার ফলেই।

কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়বার সময়েই বনফুলের কবিদৃষ্টিতে বহিঃপ্রকৃতির ছবির প্রায়-একাধিপত্য কমে আসতে থাকে। সে দৃষ্টি এখন বিচিত্র অবস্থায় পড়া বিচিত্র মানব প্রচেষ্টার উপর পড়ে থাকে। তাঁর কবি মনে ধীরে ধীরে মানবরসের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। ফলে তাঁর টুকিটাকি এই সময়ের রচনাতে ধীরে ধীরে রঙের রসের বদল সুরু হতে থাকে। ইতিমধ্যে কবিতা রচনায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সেই দক্ষতা প্রথমে অধিকার তাঁর ব্যঙ্গদৃষ্টি (কেননা সামাজিক মানুষের বিকৃতিটাই মানব প্রকৃতি অনুসন্ধানকারীর

প্রথমে নজরে পড়বার কথা। তাছাড়া বনবিহারীবাবুর প্রভাবও তার জন্যে অনেকটা দায়ী)। সেই কারণে এই সময়ের রচনাগুলির মধ্যে কবিতাগুলিই উৎকৃষ্টতর। তার আলোচনা করেছি।

গদ্য রচনা শুরু হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময়ে। কিন্তু সে সব রচনা তখনি প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং তাঁর প্রথম দিকের গদ্য রচনার মধ্যে ডাক্তারি ছাত্রাবস্থার রচনার অংশ লুকিয়ে থাকলেও তা খুঁজে বার করা মুস্কিল। পাস করার পর এখানে ওখানে— বিশেষ করে আজিমগঞ্জ হাসপাতালে— কাজ করার সময়েই তিনি নিজের অভিজ্ঞতার ও সঞ্চিত শ্রুতিস্মৃতির উপর নির্ভর করে রীতিমত গদ্য রচনা শুরু করলেন। গদ্য রচনা শুরু করলেন বটে কিন্তু পদ্য রচনা বর্জন করতে পারলেন না। তাঁর প্রথম দুটি গদ্য গ্রন্থ তাই কবিতাছত্রে আকীর্ণ। 'তৃণখণ্ড' ও 'বৈতরণী-তীরে' বই দুটিতে গদ্য ও পদ্য রচনা যে ভাবে মিশ্রিত আছে তাতে এ-দুটিকে— বিশেষ করে প্রথম বইটিকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের অনুসরণ করে "চম্পু" রচনা বলতে পারি। পরে পদ্যের পদক্ষেপ ধীরে ধীরে কমে এসেছে— তার প্রমাণ দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বৈতরণী-তীরে'ই আছে— এবং শেষে একবারে মিলিয়ে গেছে। তবে তাঁর সাহিত্য মণীষা থেকে কবিভাবনা কখনোই বিলুপ্ত হয় নি। তা ছিল তাঁর প্রতিভার স্বরূপ। বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সঙ্গে কবিভাবনার মুগ্ধ দর্শন মিলে গিয়েই বনফুলের নিজস্ব রচনা সার্থক সৃষ্টির পথে চলেছিল।

সজনীকান্তের সঙ্গে পরিচয় এবং 'শনিবারের চিঠি'তে কিছু কিছু পদ্য রচনা প্রকাশিত হলেও বনফুল পত্রিকাটির বোধ করি বিশিষ্টতম লেখকরূপে দেখা দিয়েছিলেন ১৩৪০ (১৯৩৩) সাল থেকে। সজনী-কান্ত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে 'শনিবারের চিঠি'র দায়িত্ব ছেড়ে দেন পরিমলবাবুর উপর। তিনি কাগজকে রীতিমত সাহিত্য পত্রিকায় উন্নীত করবার উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে বনফুলের আগেই বন্ধুত্ব জমেছিল। বনফুলের কলমের

জোরও তিনি তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি ভাগলপুরে এলেন বনফুলের কাছে লেখা চাইতে। এই অনুরোধের ফলে বনফুল 'শনিবারের চিঠি'র আসরে জাঁকিয়ে বসবার সুযোগ পেলেন। প্রথমে বেরুল একটি বিশিষ্ট কবিতা (বৈশাখ)? (পরিমলবাবুর 'স্মৃতিচিত্রণ' দ্রষ্টব্য।) তার পরে মাসে মাসে গদ্য পদ্য বেরুতে লাগল।

বনফুলের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'তৃণখণ্ড' ("বনফুলের তৃণখণ্ড"). বেরিয়েছিল ১৩৪২ (১৯৩৫) সালে পৌষ মাসে 'বনফুলের কবিতা'র সঙ্গে সঙ্গে। এই বইটির প্রকাশে অর্থব্যয় করেছিলেন কপিলপ্রসাদবাবু। বনফুলের পৃষ্টপোষকেরাও যে তাঁর প্রতিভার তাৎক্ষণিক যোদ্ধা ছিলেন এমন নয়। 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপবার জন্যে বনফুল 'তৃণখণ্ডে'র পাণ্ডুলিপি পরিমলবাবুকে পাঠিয়ে ছিলেন ভাগলপুর থেকে। তিনি লেখাটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশযোগ্য মনে করেন নি। "ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক রচনা লেখার পরামর্শ দিতে 'তৃণখণ্ড' ফেরৎ এল। দুঃখিত এবং বেদনার্ত হয়ে যখন ব্যর্থ সৃষ্টির বোঝা বইছিলেন তখন ভাগলপুরে গেলেন কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। বনফুলের রচনা প্রকাশে তিনি আগ্রহী। 'তৃণখণ্ড' তাঁর ভালো লেগে গেল। কলকাতায় নিয়ে এসে তিনি তা ছেপে বের করে দিলেন।" (সরোজমোহন মিত্র, 'বনফুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড ১৯৭৩।) মনে রাখতে হবে কপিলপ্রসাদবাবু সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার।

বনফুল তাঁর এই প্রথম গদ্য রচনা উপহার দিয়েছিলেন তাঁর ডাক্তারি শিক্ষার দুই শেষ শিক্ষককে,— বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও চারুব্রত রায়,— এই বলে,

> যাঁহারা নিজে 'তৃণখণ্ড' হইয়াও এই 'তৃণখণ্ড'কে সংসার সমুদ্রে ভাসমান করিয়াছেন তাঁহাদের শ্রীচরণে এই পুস্তক-খানি উৎসর্গ করিতেছি। —বলাই।

ডাক্তার চারুব্রত রায় বনফুলকে বলে দিয়েছিলেন তিনি যেন কলকাতায় প্রাকটিস না করেন। গুরুর এই উপদেশ যদি শিষ্য পালন

না করতেন তবে আমরা সমগ্র বনফুলকে পেতুম না।

বনফুলের প্রথম গদ্য বইটিতে তাঁর পরবর্তী জীবনে সৃষ্ট তুঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টির বীজমন্ত্র— ইংরেজী করে বলতে গেলে key— নিহিত আছে, এবং বইটিতেও সে মন্ত্রের মাতৃকা নিবদ্ধ আছে। আপাত মনে হয় 'তৃণখণ্ড' বুঝি মানুষ সংসার সমুদ্রে অসহায় ভাবে ভাসমান, তরঙ্গ দোলায় হাবু-ডুবু। তা ঠিক নয়। সে অর্থকে চাপা দিয়ে আছে যে অর্থ সে হল বিবেকবান ডাক্তার বা চিকিৎসা ব্যবহারী। তিনি চিকিৎসক কিন্তু চিকিৎসিতের মতোই অসহায়। তিনি ঠিক জানেন না, কিসে কী হয়। এক রোগে একই ওষুধ কখনো ফল দেয় কখনো ফল দেয় না। তবে তাঁর বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে রোগী ও তার লোকেরা তাঁকে নিজেদের মতো তৃণখণ্ড বিবেচনা করে না, ভাবে তাদের উদ্ধার তরণী। তৃণখণ্ডকে নৌকাজ্ঞান,— এই হল ডাক্তারী জীবনের ট্রাজেডি। উৎসর্গটুকু পড়লেও বইটির এই অর্থ (key) বোঝা যাবে।

'তৃণখণ্ড' মোটামুটি বনফুলের ডাক্তারি জীবিকার প্রথমদিকের অভিজ্ঞতার ফল। এই প্রথম দিক শেষ হয়েছিল আজিমগঞ্জ হাস-পাতালের চাকরি ছাড়ার পর। মোটামুটি পড়ে গেলে 'তৃণখণ্ড' গল্প বা উপন্যাস বলে কিছুতেই মনে হবে না। অনেকের কাছে হয়ত নক্শা বলে মনে হতে পারে। (হতে পারে কেন, হয়েছিলও।) কিন্তু নক্শায় যে ছবি থাকে তা বেমিল কিন্তু jigsaw puzzle নয়। 'তৃণখণ্ড'ও ঠিক jigsaw puzzle নয়। ছবিগুলি অসংলগ্ন ও বিপর্যস্ত মনে হলেও আসলে লেখকের চিত্তমুকুরে তার প্রতিফলন ধারাবাহিক বটে। কাহিনী গল্প নয়, টুকরো টুকরো গল্পের গাঁথা ডোর বলা যেতে পারে। গাঁথনির সুতোর মধ্যে দিয়ে খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি এক অপরিস্ফুট কিন্তু স্পষ্ট গল্পের সমগ্রতা পেয়েছে।

লেখক ডাক্তারের চিত্ত যেন তারের গুচ্ছের ঘের আর তাঁর অভিজ্ঞতা যেন ঘুরন্ত চুম্বকের মতো। লেখকের চিত্তে ভাবনার স্রোত তুলে চলেছে। তার-গুচ্ছ আর চুম্বকের মধ্যে যে ব্যবধান তা কিন্তু শূন্য নয়।

তা যে বাষ্পে পরিপূর্ণ তা হল নায়ক ডাক্তারের বিমুখ প্রেয়সীর ভাবনা। এই ভাবনায় বিচিত্র চিত্রগুলির কবিতাপট বিস্তার করে চলেছে। আরম্ভ পটে,

মনের আকুতি বুঝাব কেমনে কথায় বলি,
কি করে প্রকাশ করিব বল না— কিছু না জানি
গভীর সাগরে বাড়ব-অনল মরিছে জ্বলি,
বুঝাব কি করে সাগর জলের জ্বালার বাণী !···

পটের শেষ,

আঁধার— আঁধার খালি, চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার,
তীব্র বেগে বহিতেছে বায়ু,
খুঁজি কারে হাতে লয়ে ক্ষুদ্র দীপ ত্রস্ত শিখা তার,
অতি অল্প অলিখিত আয়ু !
অচিরাৎ বায়ুবেগে নিভে যাবে ক্ষুদ্র দীপশিখা,
অকস্মাৎ অন্ধকারে চূর্ণ হবে স্বপ্ন-অট্টালিকা,
স্রোতমুখে তৃণ-খণ্ড ! বক্ষে তার প্রেম-মরীচিকা
দুঃখে সুখে কাঁপে তার স্নায়ু।
আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য-লিপিকা
লয়ে একা অলিখিত আয়ু।

মৃত্যুর সঙ্গে অবিরত কারবার করতে করতে, সেই সঙ্গে প্রেমের কর্মের বিচিত্র পরিণাম দেখতে দেখতে নবীন ডাক্তার-কবিও জীবনে ভরসা হারিয়ে ফেলেছেন যেন।

'তৃণখণ্ড' আসলে প্রেমের গল্প, ব্যর্থ অপার্থ অযথার্থ প্রান্ত-অপরিণত প্রেমের,— বিশ্ব ট্রাজেডির।

'তৃণখণ্ডে'র চিত্রগুলিতে বনফুলের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে তাঁর চিত্তের অভিষেক পেয়ে। অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, জীবনপ্রেমিক সে চিত্ত। বাইরে থেকে যতই অসংলগ্ন দেখাক পরিণতিতে চিত্রগুলি যেন পরস্পরের প্রতিপূরক হয়েছে। চমৎকার climax হয়েছে নয়ন মল্লিকের চিঠিতে ও

আসমানীর বাবার কথায়।

'তৃণখণ্ডে'র যেমন সমাদর হওয়া উচিত ছিল তেমন কিছুই হয় নি। বইটি গ্রন্থাবলীতে নিবদ্ধ হবার আগে দ্বিতীয় সংস্করণ পেয়েছিল বলে মনে হয় না। বইটিকে প্রশংসা করে কবি মোহিতলাল মজুমদার বনফুলকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতেও বইটির আসল মাহাত্ম্যের হদিস নেই। মোহিতলাল লিখেছিলেন, "গল্পগুলির মধ্যে লেখকের 'আত্ম-চরিত' বা 'আত্ম-পরিচয়' যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই বইখানি এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।" 'তৃণখণ্ডে' বনফুলের আত্মকথা বিন্দুমাত্র নেই। আছে আত্মসমীক্ষা। বাইরের ঘটনার তাৎপর্য তার ভাবুক চিত্তে যে সংঘাত এনেছিল তারই প্রতিক্রিয়া এই বইটিতে প্রতিফলিত। এতে আত্মচিন্তা আছে, আত্মপরিচয় কিছু আছে অবান্তর ভাবে কিন্তু আত্ম-চরিত বিন্দুমাত্র নেই। (অবশ্য তাঁর কেসগুলির কথা এখানে ধরছি না।)

বনফুল দ্বিতীয় গদ্য গ্রন্থ 'বৈতরণী-তীরে' প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯৩৬), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স কর্তৃক। 'তৃণখণ্ডে'র সঙ্গে এ বইটির বিশেষ মিল আছে। দুটি এক জাতেরই রচনা। 'তৃণখণ্ডে'র চিত্রগুলিতে বেখাপ্পা প্রেমের জবরদস্তির পরিণাম আঁকা হয়েছে। 'বৈতরণী-তীরে'র চিত্রগুলিতে প্রেমের— বেখাপ্পা ঠিক নয়, এক তরফা — ভুল বোঝাবুঝির শোচনীয় ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে।

'বৈতরণী-তীরে' লেখবার সময়ে বনফুল যেন কিছু পিছু হটে তাঁর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রাবস্থায় ফিরে গেছেন। যখন তিনি শবব্যবচ্ছেদ করেন, মৃতদেহ, কঙ্কাল ঘাঁটেন। আবার অন্য দিকে তিনি এগিয়ে এসেছেন; এ বইয়ে যেন তাঁর নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। তিনি যেন চিত্রগুপ্ত, খাতায় নোট করে চলেছেন। 'তৃণখণ্ডে' তাঁর নিজস্ব ভূমিকা ছিল। সে ভূমিকা ছিল যেন অক্ষম বিচারকের, যে বিচারক অন্তরে অন্তরে আসামীদের প্রতি ক্ষমাশীল, কেননা নিজেই তিনি ব্যর্থ প্রেমিক।

'বৈতরণী-তীরে' লেখক একেবারে নিরপেক্ষ সংসারেও যে তিনি ভুক্ত-ভোগী। এ বইটিতে কবিতাগুলি আর লেখকের জবানিতে নেই, আছে হতভাগ্য কবির জবানিতে। ('বৈতরণী-তীরে' কবিতার পরিমাণ অনেক কমে গেছে অতঃপর প্রায় বিলুপ্ত।)

'বৈতরণী-তীরে'র সব চিত্রই মেয়ে পুরুষের— নিষ্ফল প্রেমে আত্মঘাতী। তারা যেন মরেও মরে নি। নিজেদের ব্যর্থতার মন্থনদণ্ডের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

'বৈতরণী-তীরে' সবাই প্রেত। একমাত্র মানুষ লেখক-নায়ক। তিনিও প্রেতের মতো দগ্ধ হচ্ছেন তবে আত্মহত্যা করে নয়। আত্মহত্যা করেছে যারা তারা যেমন তিনিও তেমনি স্মৃতির জ্বালায় জ্বলছেন।

অদ্ভুত আমার স্মরণ শক্তি।··· কিছুই ভুলি না। কোথায় কবে ছার-
পোকাটি মারিয়াছি, তাহার চেহারাটা পর্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে।
নিস্তব্ধ রাত্রে আমার সঙ্গে জাগিয়া আছে আমার স্মরণ শক্তি।

বনফুলের তৃতীয় গদ্য গ্রন্থ 'দ্বৈরথ' (বৈশাখ ১৩৪৪) ডাক্তারির গল্প বিবর্জিত সাধারণ ধরণের ছোট উপন্যাস বা বড়ো গল্প। (প্রথমে এটি ছোটগল্প করেই লেখা হয়েছিল।) বিহারের দুজন যুবক জমিদারের মল্লক্রীড়ার মতো যেন পাল্লা দেওয়া। প্রতিদ্বন্দ্বীরা হল শ্যালক-ভগিনীপতি। দুজনের দ্বন্দ্ব মেটাতে গিয়ে নায়িকা প্রাণ বিসর্জন দিলে। কাহিনীর মধ্যে কিছু সত্য থাকা অসম্ভব নয়।

বড়োভাই আর স্বামী— ভালোবাসার এই দুজনের মধ্যে ব্যর্থ বিরোধের কাঁটা দূর করবার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কাহিনী স্মরণ করায়। পাত্র পাত্রীর কোন প্রতিবিম্বন নেই এতে, ঘটনার মধ্যে যে মিল আছে তা নিতান্ত বাহ্য। তবুও বলব 'যোগাযোগ' পড়া না থাকলে বোধ হয় 'নায়িকা বহ্নিকুমারী'র সৃষ্টি হতে পারত না। বইটি চমৎকার রোমান্টিক কাহিনী, তবে ট্রাজেডি। ট্রাজেডি বাদ দিলে গল্পটি নেহাৎ জলো হয়ে যেত।

'দ্বৈরথ' নামটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া। উপহার দিয়েছিলেন বনফুল তাঁর পিতাকে।

'কিছুক্ষণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। উপহার দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। বনফুলের লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুসি ছিলেন। বইটি "অগ্রগামী কবি" রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

'কিছুক্ষণ' বনফুলের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টিক উপন্যস্ত রচনা। ছোট বই, গল্প বললেও বলা যায়, চিত্র বললেও বলা যায়। তবে চিত্রাবলীর মধ্যে দিয়ে একটা গল্পের কাঠামোর যেন আভাস পাওয়া যায়।

এক বিশেষ দিনে কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটি নগণ্য বিশেষ স্থানে অবস্থাগতিকে যে জনবৈচিত্র্য ও তাদের সংঘর্ষ ঘটেছিল সেই ক্ষণপ্রবাহিত মানব-ইতিহাস স্রোতের একটি পরিষ্কার **vertical cross section** আঁকা পড়েছে 'কিছুক্ষণ'-এ। এমন বস্তু ইংরেজী সাহিত্যেও দেখি নি।

চিত্রটি যেন স্রষ্টা লেখকের ডায়েরি। তিনি চলেছেন গ্রামের বাড়ী থেকে গরুর গাড়িতে করে ছোট এক রেল ষ্টেশনে। সেখানে তিনি কলকাতার ট্রেন ধরবেন। সেখানে তিনি কলেজে পড়েন। গাড়ির গোরু দুটি দুর্বল। এদিকে ট্রেনেরও সময় হয়ে এল। গোরুগুলিকে প্রাণপণ খাটিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে শোনা গেল আপ্ লাইনে একটু দূরে এক্সিডেণ্ট হওয়াতে ডাউন গাড়ি আসতে দেরি আছে। কত দেরি তা বলা যায় না। সেই কারণে একটি আপ্ ট্রেনও ষ্টেশনে আটক রয়েছে। আপ্ ট্রেনের যাত্রী ও ডাউন ট্রেনের প্রার্থী যাত্রীরা মিলে ছোট্ট ষ্টেশনটিকে বেশ সরগরম করে রেখেছে। সেই অপরিচিত জনতায় দ্রষ্টা-লেখক মিশে গেলেন। নিজের বিছানা ও সুটকেশটি কোথায় নামিয়ে রাখবেন তা ভাবছেন এমন সময় দেখা হয়ে গেল টেলিগ্রাফ-অপারেটরবাবুর সঙ্গে। তিনি অল্প কিছুকাল আগে এ ষ্টেশনে বদলি হয়ে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে একটু আলাপও হয়েছিল ইতিপূর্বে। এই টেলিগ্রাফ-বাবুটিকে 'কিছুক্ষণ' চিত্রের প্রধান অভিনেতা বলা যায়। প্রভাতকুমারের গল্পে

রেলের বাবুদের ছবি দেখেছিলুম। এখানেও তেমনি **genuine** ছবি দেখলুম। তবে এ ছবিতে সামান্য বাস্তব স্বাদ থাকায় **documentory value** যেন একটু বেশি বলে মনে হয়। যে এক্‌সিডেন্টের জন্যে গাড়ি আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তা খুব গুরুতর নয়। কিন্তু তা ঘটেছিল সেই ষ্টেশনেরই পয়েন্টস্‌ম্যান রামদীনের গাফিলতিতে। একটু পরেই কর্তৃপক্ষের লোক আসবে তদন্ত করতে। রামদীন ধরা পড়লে ষ্টেশনের বাবুরাও রেহাই পাবেন না। তা ছাড়া অনুগত রামদীনকে রক্ষা করা তো তাঁদের কর্তব্য। তাকে বাঁচাতে গেলে আটকে পড়া ড্রাইভারকে জড়ানো ছাড়া উপায় নেই। আবার তাকে জড়াতে গেলে তাকে মদ খাইয়ে অপ্রকৃতিস্থ করতে হয়। সেই কাজেই তার বাবু ও তাঁর উপর-ওয়ালার মন পড়ে আছে। ভদ্রলোকের নাম মাখনলাল। তিনি লেখককে নিজেদের আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর গাড়ি বন্ধ হওয়ার প্রসঙ্গে রামদীনের কীর্তি ফাঁস করে দিয়ে বললেন গলা খাটো করে, "আমরা রামদীনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আপনি যেন কথাটা বলে বেড়াবেন না।"

টেলিগ্রাফে খবর এল যা তাতে বোঝা গেল সন্ধ্যার আগে রিলিফ ট্রেন পাওয়া যাবে না। সুতরাং ট্রেন গতায়াত রাত্রির আগে নয়। শুনে লেখক বাইরে গেলেন ঘুরে ফিরে দেখবার জন্যে। প্রথমেই নজর পড়ল প্লাটফর্মের কোণে জলের কলটার দিকে। সেখানে বেশ ভিড় জমেছে। "ভৃত্য-স্থানীয় একটি ছোকরা একটি প্রকাণ্ড কুঁজায় জল ভরিতেছিল।" সে কারো কথায় বিচলিত না হয়ে কুঁজোয় জল ভরেই চলল। কারো প্রতিবাদ সে কানে তুলছে না। শেষে এক "দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ কাবুলিওয়ালা বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া আগাইয়া গেল এবং এক ঝটকায় ছোকরাকে সরাইয়া দিয়া নিজের বদনা ভরিতে সুরু করিয়া দিল।" লেখক যখন এক ভদ্রলোকের শুচিতাবিদ্ধ বিধবা কন্যার একাদশীতে জল গ্রহণের জন্যে জল আনতে গেলেন তখনও কাবুলিওয়ালা কল ছাড়ে নি। "সে তখন তোড়ে কল্ল খুলিয়া দিয়া মাথা ধুইতেছে। আমি কাছে আসিতেই সে

আমার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে চাহিল। চাহিবামাত্র আমি তাহাকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বুঝাইয়া বলিলাম যে, একটি জেনানী অত্যন্ত পিপাসার্ত, তাহার জন্য জল অবিলম্বে প্রয়োজন, সুতরাং কলটা একবার ছাড়িয়া দেওয়া দরকার।" "জরুর", বলে কাবলিওয়ালা তখনি কল ছেড়ে দিলে।

কাবলিওয়ালাকে আবার একবার দেখা গেল। একটা গোরুর গাড়ীর চাকা কাদায় পড়ে গেছে শীর্ণ গোরুদুটি প্রাণপণ চেষ্টাতেও গাড়ী তুলতে পারছে না। গাড়োয়ান কিন্তু সমানে তাদের লাঠিপেটা করে চলেছে। চারদিকে লোক জমে গেছে। কিন্তু কিছুই করছে না। লেখক এসে পড়ে সাহায্য করতে চাইলেন গাড়োয়ান তা গ্রাহ্য না করে গোরু দুটির উপর বাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল। এমন সময় সেই কাবুলিওয়ালা এসে হাজির। "ছোড়ো",-বলে সে এগিয়ে গোরু দুটিকে খুলে দিলে। "এই আগা সাহেব, কেয়া করতা ?" বলে গাড়োয়ান একটু বাধা দেবার চেষ্টা করলে। "তুম আদমি নেহি, জানবার হ্যায়।" বলে সে গোরু দুটিকে একটু দূরে বেঁধে রেখে এসে লেখককে দেখতে পেয়ে সেলাম করে বললে, "আইয়ে বাবুসাব, থোড়া হাত লাগা দিজিয়ে।" ঠেলাঠেলিতে গাড়ী কাদা থেকে উঠে গেল। "কার্য সমাধা করিয়া কাবুলিওয়ালা পস্তু ভাষায় কি বলিয়া গেল, বুঝিলাম না, য, জ, এবং 'Z'-এর ঝড় বহিয়া গেল। পরিশেষে সে আমাকে আবার সেলাম করিয়া বিদায় লইল"।

মাখনলালবাবু আর তাঁর পত্নী বিনোদিনী 'কিছুক্ষণে'র পটের প্রধান চিত্রের নায়ক-নায়িকা। তবে মাখনলালবাবুর কাজ কর্ম প্রকাশ্যে, বিনুর কাজ-কর্ম ঘরের মধ্যে এবং তাঁর আচরণ মাখনলালবাবুর ব্যাখ্যা-পুষ্ট ' অত্যন্ত দুর্লভ স্বাভাবিক বাঙালী মেয়ে বিনু।

"মাখনবাবুর কোয়াটারের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। মাখনবাবু বাহির হইতেই চীৎকার করিলেন, কই বিনু, চা রেডি তো? আমার সেই বন্ধুটিকে ধ'রে এনেছি। চা দাও।

"বিনু ওরফে বিনোদিনীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মাখনবাবু

তখনও আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া ভিতরে গেলেন। মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'সে কি? চায়ের জল এখনও চড়াও নি?

"আমার তো পাঁচটা হাত নয়। বাসন মেজে, ঘর ধুয়ে এইতো সবে কাপড়টি ছেড়েছি। বন্ধু আবার কে?

"শুনিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। মাখনবাবু বাহিরে আসিয়া সহাস্যমুখে আমাকে বলিলেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন— আগেকার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বিন্নু সেটা আর দিতে চায় না। ফ্রেশ জল চড়াচ্ছে। আসুন।"

মাখনবাবু বিন্নু ষ্টেশন মাষ্টার ও তাঁর পত্নীকে নিয়ে বেশ একটি বড়ো গল্প লেখা যেতে পারত।

দ্রষ্টা-লেখকেরও প্রেমে পড়বার মতো পাত্রীর অভাব ছিল না। দুটি খুব ভালো পাত্রীই ছিল। এক অ্যালিস্-ইন্-ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড পড়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বিধবা কন্যা মিন্নু, অপর প্ল্যাটফর্মপ্রান্তে ট্রাঙ্কের উপর একলা বসে থাকা মেয়েটি যাকে উদ্দেশ্য করে কতকগুলো ছোকরা ঠাট্টাতামাসা করছিল। প্রথম মহিলা অত্যন্ত শুদ্ধাচার পরায়ণ, তাই তাঁর প্রতি লেখকের প্রীতিরস জাগা-সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় মহিলাটি বাগদত্তা। লেখক তাঁকে প্রচুর সহানুভূতি দেখিয়ে ছিলেন। হয়তো "খ্রীষ্টান" আর "মুচির মেয়ে" শুনেই তাঁর চিত্ত অবদমিত হয়েছিল। লেখকের প্রেম-ভাবনার কোন রকম ছিটে-ফোঁটাও না থাকায় খুব ভালো হয়েছে। নইলে— দ্রষ্টার দৃষ্টির কাছে রঙ ধরে থাকলে সাধারণ জীবন প্রবাহের অমন দুর্লভ **cross-section**-এর ছবিটি আমরা নির্মল ভাবে পেতুম না।

সন্ধ্যার আগেই রিলিফ গাড়ীতে উচ্চকর্মচারী দুজন এসেছিলেন। তাঁদের একজনের বাগদত্তাই সেই খ্রীষ্টান মেয়েটি। এঁরই কাছে মহিলা আসছিলেন।

ড্রাইভারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখে অফিসাররা চলে গেলেন। ড্রাই-ভারের মা-মরা মেয়েটিকে দেখে দ্রষ্টা-লেখকের মন হুহু করে উঠল।

"একবার ভাবিলাম, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিই। কিন্তু মাখনবাবুর কথা স্মরণ করিয়া তাহা পারিলাম না।"

রবীন্দ্রনাথ 'কিছুক্ষণ' পড়ে খুব খুসি হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি লেখা চিঠিতে এই খবর পাই, "উল্‌টে পড়া রেলগাড়ি যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নিয়েছ। এর মধ্যে ঝাঁজ আছে কম নয়, সেটা যে কেবল স্বাদের পক্ষে ভালো তা নয়, পথ্যও বটে। সমস্ত বইখানার মধ্যে কেবল প্রথম প্যারাগ্রাফটার উপর আমি কালির আঁচড় না চালিয়ে থাকতে পারি নি।"

যে প্রথম প্যারাগ্রাফটুকু রবীন্দ্রনাথের খুব খুসি করতে পারে নি তা এখানে উদ্ধৃত করছি।

> সময়ের স্রোত বাহিয়া চলিয়াছে।
>
> সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ তারা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জন্ম-জীবন-মৃত্যু সব চলিয়াছে। কত আশা-নিরাশা, আনন্দ-অবসাদ, স্তুতি-নিন্দা, সুন্দর-কুৎসিত, কালস্রোতের ঘূর্ণাবর্তে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। অদৃশ্য ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া— কিংবা হয়তো লক্ষ্য না করিয়াই— নিখিল বিশ্ব ভাসিয়া চলিয়াছে।
>
> আমিও চলিয়াছি।

এই দর্শন-কবিত্বের উদাত্ত উচ্ছ্বাসটুকু যে সমগ্র রচনাটির পক্ষে কিঞ্চিৎ বেসুরো বেজেছে তা শুধু রবীন্দ্রনাথই টের পেয়েছিলেন। বনফুলও রবীন্দ্রনাথের উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। পারলে এটি বাদ দিতেন অথবা বদলে দিতেন।

'কিছুক্ষণ' পাঠক সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয় নি। বইটির তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল 'শ্রীগুরু লাইব্রেরী' থেকে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের আগেই।

১৯৪০ (অগ্রহায়ণ ১৩৪৭) খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল বনফুলের প্রথম

কিঞ্চিত পুষ্টকায় সোজাসুজি উপন্যাস 'নির্মোক'। এর প্রায় বছর দুই আগে বেরিয়েছিল তাঁর প্রথম নাট্যরচনা 'মন্ত্রমুগ্ধ'। 'নির্মোক' প্রকাশ করে ছিলেন গোপালদাস মজুমদার (ডি. এম. লাইব্রেরী)। তার আগে বইটি ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী পত্রিকায়' বার হয়েছিল। বইটি পাঠকের অনাদর পায় নি। ১৩৫২ সালে দ্বিতীয় ও ১৩৫৫ সালে তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল।

সোজাসুজি বলছি বটে কিন্তু ঠিক সোজাসুজি উপন্যাস নয় 'নির্মোক'। লেখকের 'নিজের কথা' উপন্যাসটির কাহিনীগুচ্ছের মেরুদণ্ডের মতো। এবং তা প্রায় সবটাই বনফুলের নিজের কথা। বাকিটা তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানদৃষ্টি থেকে এসেছে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার উদ্যোগ থেকে দেশে গিয়ে চাষ ও স্বাধীন ডাক্তারি করা পর্যন্ত সবটাই বনফুলের আত্মকাহিনী। নয় কেবল স্ত্রীবিয়োগ এবং চাষ করা। তবে চাষ করার অর্থে যদি বই লেখা বুঝি তবে সেটাও ঠিক। সুতরাং 'নির্মোক'কে জীবনী-উপন্যাস বলতে পারি। আরও খুঁটিয়ে দেখলে বলতে হয় প্যাথলজিক্যাল—(অর্থাৎ বাংলায় পরিভাষা সৃষ্টি করতে গেলে, "চৈকিৎসিক") উপন্যাস। লেখকের ভাবশুদ্ধি বিজ্ঞানদৃষ্টি ও সমবেদনার ভিয়েনে সাহিত্যের বাইরের বস্তুও উপন্যাসটিতে গ্রহণযোগ্য ও সুস্বাদু হয়েছে।

উপন্যাসটির নাম সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। লেখকের নিজের উপর দৃষ্টিরেখে 'নির্মোক' নাম রাখা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসটি তো একতারা নয়, বহুতার বীণা। মেরুদণ্ড-গল্প ছাড়াও আরও কিছু আনুষঙ্গিক কাহিনী আছে যার মূল্য কাহিনীর চেয়ে কম নয়। যেমন সুব্রত-সুপ্রিয়ার কাহিনী, অমর-বিনোদীনির কাহিনী। এই ঝুরিনামা কাহিনীগুলিকে মর্যাদা দিলে উপন্যাসটির উপযুক্ত নাম হয়— "ন্যগ্রোধ" (সংস্কৃত-মতে) অথবা "ঝুরি" বা "নামনা" (বাংলা অনুসারে)। ঝুরির কোনটি মাটি ছুঁয়ে শেকড় গেড়ে পুষ্ট হয়েছে, কোনটি বা ডগশুকিয়ে ঝুলছে।

অমর-বিনোদিনীর কাহিনী বনফুল পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে (৮ চৈত্র ১৩৪০ তারিখে লেখা চিঠি ?)। এটি নিয়ে একটি আলাদা বই লেখা চলত।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তক আকারে বার হয় 'মৃগয়া'। রচনাটি একাধিক দিক দিয়ে অভিনব। উপস্থাপন উপন্যাসের মতো নয় গল্পের মতোও নয়, চিত্রের মতো। তবে গল্প-উপন্যাসের ধারাবাহিকতা আছে। রচনাটি তিনভাগে বিভক্ত— "গ্রামে", "পথে" ও "প্রান্তরে"। তিনভাগের রচনার স্বাদ তিন রকম। প্রথম ভাগ গদ্য কবিতা, দ্বিতীয় ভাগ উপন্যাস-গল্প, তৃতীয় ভাগ নাটক (এবং নাটকের মতো কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত) এই অপূর্ব অভিনবতার জন্যে 'মৃগয়া'কে— চম্পূর অনুকরণে— "ত্রিবেণী" রচনা বলা যায়।

বিষয় এক পাড়াগাঁয়ে জমিদারবাড়ীর গ্রাম শুদ্ধ শিকার যাত্রা-কাহিনী। জমিদার বাবুরা সস্ত্রীক তিন ভাই, তাঁদের মা. মেয়ে-জামাই, কর্মচারী-পরিচারক, বন্ধু-বান্ধব, মোড়ল-প্রজা সকলেই দূরে নদী মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের ধারে চলেছে বাঘ শিকারে। পোঁছে তাঁবু ফেলা হয়েছে জঙ্গলের মুখে মাঠে। সন্ধ্যার পর জোৎস্নায় বন মাঠ প্লাবিত হয়ে গেল। ছোট বড়ো নায়ক-নায়িকা যাদের এতদিন ঘরের গণ্ডীতে সমাজ বন্ধনের খাঁচায় মনের স্বাভাবিক প্রেমপ্রবাহ নিরুদ্ধ ছিল তা এই পরিবেশে অপসারিত হয়ে গেল। বাঘ-বাঘিনীর মিলনে বাধা রইল না। আসল বাঘ মারবার মাচানগুলি খালি পড়ে রইল। এই ঝরঝরে রোমান্টিক কাহিনীকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের গানের ছত্রের যেন তান বিস্তার,

জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে—
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

কাহিনীর সূত্র (বিদেশী সাহিত্য থেকে-?) যুগিয়ে ছিলেন অধ্যাপক কালিকান্ত সরকার। বইটি তাঁকেই উপহৃত।

প্রথম কয়েকছত্র উদ্ধৃত করে গদ্য কবিতায় লেখা প্রথম ভাগের রচনা-নির্দশন দিই।

হিরণপুর গ্রামে জেগেছে সাড়া,
বিপিন ঘোষ, হরু মণ্ডল, জগদেও পাঁড়ে থেকে সুরু করে
ঝাংরুসর্দার, বাদল ডাক্তার, লাহিড়ী, তিনু চাটুজ্জে,
তালুকদার মশাই, হরিশ খুড়ো,
এমন কি ডিস্‌পেপ্‌সিয়া-গ্রস্ত নিতাই পর্যন্ত
উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।
বস্তুত, না হয়ে উপায় নেই।
স্বয়ং জমিদার বাবুরা যখন উৎসাহিত হয়েছেন
এবং নানাভাবে তা প্রকাশ করেছে,
তখন
বাকি সকলকেও
বাধ্য হয়েই
জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে
উৎসাহ-ঐক্যতানে সুর মেলাতে হচ্ছে।...

কাহিনীতে প্যাথলজির কোন ছোঁয়াচ নেই। তবে ডাক্তার একজন আছেন। তিনি যেন লেখকেরই ছদ্মবেশী, নাটকের প্রম্প্‌টারের মতো। বাদল ডাক্তারের দুটি কবিতাও আছে।

১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বই হয়ে বেরুল 'রাত্রি',—'কিছুক্ষণ' বাদ দিলে বনফুলের শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৩৬০ সালের মধ্যে বইটি আরও তিন বার ছাপা হয়েছিল। সুতরাং সমাদর হয়েছিল বুঝতে হবে।

'রাত্রি'র বিষয় খুব জটিল এবং বৈজ্ঞানিক। নারীর প্রেম ও তার আকর্ষণ শক্তির বিপরীতমুখিতার বিষম দ্বন্দ্ব এই ক্ষীণকায় উপন্যাসটিতে বনফুল তার বিজ্ঞান দৃষ্টিকে অম্লান রেখে সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। অপটু লেখকের হাতে যা বিষম বিস্ফোরণ ঘটাতে পারত

তা বনফুলের হাতে রঙের তুবড়ি ফুটিয়েছে।

পূর্ণেন্দুবাবুর পুত্র স্বর্ণেন্দু, কন্যা রাত্রি। স্বর্ণেন্দু যেমন ফরসা রাত্রি তেমনি কালো। কিন্তু কালো হলে কী হয়। তার রূপের টান দুর্নিবার। জ্যোতির্ময় পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রীর পালিত সন্তান। রাত্রি জ্যোতির্ময়কে ভালোবাসে কিন্তু তার মায়ের কিছুতেই ইচ্ছা নয় যে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে রাত্রির বিয়ে হয়। রাত্রির জীবনে এই হল ব্যর্থতার বীজ। শেষে জানা গেল স্বর্ণেন্দু রাত্রির মা পূর্ণেন্দুবাবুর বিবাহিত পত্নী নন, আর রাত্রিও পূর্ণেন্দুবাবুর কন্যা নয়। জ্যোতির্ময় রাখালবাবুর বৈধ সন্তান এবং যিনি পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী বলে পরিচিত তিনি আসলে রাখালবাবুর পত্নী। রাখালবাবু মহৎ লোক। তিনি ভ্রষ্টা স্ত্রীকে গ্রহণ করেছিলেন, স্ত্রী বলে না হোক শিষ্যা বলে। রাত্রির সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের বিবাহের বাধা ছিল দারুণ,— ওরা পরস্পর বৈপিত্র্য ভাইবোন। কিন্তু অঘটন আটকানো গেল না। জ্যোতির্ময় প্যারিসে চলে গেল। রাত্রির গর্ভে তার সন্তান আছে জেনেও, রাত্রির প্রেমমুগ্ধ বক্তা-নরেন তাকে বিয়ে করলে। সন্তান নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিও রয়ে গেল নাগালের বাইরে। এই ভাবে সমাপ্তি।

কাহিনীর নায়ক দুটি। এক মহানায়ক রাখালবাবু (যিনি কাহিনীর গোড়ার দিকে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রীর গুরু বলে উল্লেখিত) মহাপুরুষ যিনি পত্নীর অশেষ ভ্রষ্টাচার ক্ষমা করে তাকে ভেসে যেতে দেন নি। দুই রোমান্টিক নায়ক— বক্তা-লেখক। তিনি সসত্ত্ব রাত্রিকে বিয়ে করে তার মাথার উপর ছাতা ধরতে এগিয়ে এসেছিলেন।

রাত্রির জনক— এক হাবশি ড্রাইভার। এখানে শৈলবালা ঘোষ-জায়ার সেখ আন্দুর কথা মনে পড়ে। রাত্রিকে বনফুল যেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষনিকার' কবিতাটির অনুপ্রাণনায় এঁকে গেছেন,

কালো তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

বনফুল বর্ণনা করেছেন,

ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, কালো রঙ। এমন কালো সাধারণত দেখা যায় না। মিশ কালো, কুচকুচে কালো প্রভৃতি কালো-রঙ-প্রকাশক বিশেষণগুলি দিয়ে কালো বর্ণনা করা যাবে না। কারণ, তার রঙে শুধু কালিমা নয়, কোমলতাও ছিল— মখমলের মত অদ্ভুত একটা কোমলতা। অতি পেলব, অতি মৃদু, অতি আশ্চর্য শ্রী এই কালো রঙের নিবিড়তায় আবিষ্ট হয়ে স্বপ্ন দেখছিল যেন। কুচকুচে কালো চোখ দুটো আরও অদ্ভুত— চঞ্চল নয়, নিষ্পলক। যখন যতটুকু দেখে, নির্নিমেষে দেখে, যার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে বিদ্ধ করেছে তত মনে হয় না, যত মনে হয় নিঃশেষ করছে— মনে হয় তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব যেন দেখতে পাচ্ছে ও।

'সে ও আমি' (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫০, তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৬৪ ; বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে উপহৃত) উপন্যাসটির কাঠামো একটু অভিনব। নামকরণে ও কাঠামোর ছাঁচে রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইটির (—আপাত অল্পবয়সীদের জন্যে লেখা— ; ১৯৩৭) ছায়া পড়েছে। কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে 'সে ও আমি'র কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। 'সে' আর 'আমি' হল নায়কের **split personality,** অর্থাৎ দ্বিখণ্ড স্বরূপ, বৈদিক কাব্যের উৎপ্রেক্ষায় বলা যায় কতকটা যেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া", আরও ভালো করে বলা যায় যেন জামার ও-পিট এ-পিট। আমি নায়কের বাইরের রূপ ; সে, নায়কের মনের স্বরূপ। আমি করছে, সে তা যেন পর্যালোচনা করে ডায়েরি লিখছে।

নায়কের এই জীবনকথা যেন বৈষ্ণবপদাবলীর শুকসারী-সংবাদের মতো দ্বিতলে বর্ণিত হয়েছে। নায়ক আধুনিক বাঙালী সন্তান, ভদ্র ঘরের ছেলে, শিক্ষিত। সে দেশহিতৈষিতার সমসাময়িক আন্দোলনে আন্দোলিত, ভাবুক অথচ কর্মপ্রবণ। ভিতরে ভিতরে সাহিত্য রসের ভিয়ান আছে। নায়কের মধ্যে লেখক নেই— অর্থাৎ ডাক্তার বলাই

চাঁদের কোন ছাপ বা ছোপ নেই— তবে বনফুলের চিন্তার পুষ্পসম্ভার-পল্লব প্রচুর আছে। একজন দেশবরেণ্য নেতার ছাপ খুবই স্পষ্ট। মূল কাহিনী প্রেমের। দুটি নায়িকা— শিক্ষিত বিদগ্ধ যুবতী মালতী, অশিক্ষিত স্নিগ্ধ কিশোরী মিনতি। নায়ক ভালোবাসে মালতীকে, কিন্তু তার প্রেমের বক্রতায় সে থই পায় না। তার উপর সে হয়ে গেছে পরস্ত্রী। সংসারের, জীবনের প্রয়োজনের চাপে পড়ে সে পিতার নির্বাচিত মিনতিকে বিয়ে করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-র ভাব রয়েছে এই রকম ত্রৈভুজিক সম্পর্কে। তবে প্রথম নায়িকার সম্বন্ধে বনফুল যতটা বাস্তব হয়েছেন— অবশ্য বেশ রেখে ঢেকে— রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তার একটুও সম্ভব ছিল না, এবং প্রয়োজনও ছিল না।

দেশের ধাতু ও অবস্থা সম্বন্ধে লেখকের যে সব মন্তব্য প্রাথমিক ভাবে উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে যথেষ্ট ভাববার জিনিস আছে। যেমন,

> যাদের নিরঙ্কুশ মাড়োয়ারী বলে ঠাট্টা করলেন, পারেন তাদের মতো হতে? মাত্র লোটা-কম্বল সম্বল করে এসে একাগ্র ব্যবসায় বুদ্ধি, দুঃখসহনশীলতা, লোকের হৃদয় জয় করবার ক্ষমতা—এক কথায় তাদের চরিত্রবল কি তুচ্ছ করবার মতো?
>
> আমি। এতদিন তাহলে যা করলাম, সেটা কি?
>
> সে। কিছুই নয়। অপরের কথা কপচেছেন। অপরের লেখা স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। লেনিনের কথা শুনে কমিউনিজম করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখে কাব্য করেছেন; কিন্তু ভুলে গেছেন, আপনার নিজের মূলধন একটি কানা কড়ি নেই।

'জঙ্গম' বনফুলের বৃহত্তম রচনা। পুস্তকাকারে বেরিয়ে ছিল প্রথম অধ্যায় প্রথম খণ্ডরূপে বৈশাখ ১৩৫০ সালে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ডরূপে ১৩৫১ সালে; চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডরূপে শ্রাবণ ১৩৫২ সালে। দীর্ঘকাল ধরে লেখা, তবে রচনাটির গঠন এমনই যে কোথাও খেই হারাবার সম্ভাবনাও জাগে নি। বইটিকে উপন্যাস বলা

চলে না। বলতে গেলে মানুষের এক বিশেষ সমষ্টির চিত্রপট, এক আধ দিনে নয়। অনেক বছর ধরে। 'কিছুক্ষণ'-এর সঙ্গে 'জঙ্গম'-এর জাতিসামা আছে। 'জঙ্গম'ও **cross section of a piece of life,** তবে **vertical** নয়, **horizontal**। সেই কারণে এতে যে পরিণামের রেশ চলেছে তা 'কিছুক্ষণে' ছিল না।

উপন্যাসের ক্ষীণ আভাস যে একেবারে 'জঙ্গমে' নেই তা নয়। নায়ক শঙ্করের বেলা পরিণতি আছে। আসলে বইটি যেন শঙ্করেরই জীবনচরিত— তার কলেজি শিক্ষার পথ ছেড়ে দিয়ে জীবনে সার্থকতা ও সেই পথে প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনী এই চিত্রপটের মধ্যে ধারাবাহিত হয়েছে।

আসলে 'জঙ্গম' সজনীকান্তের ভাবগত জীবন কাহিনী। আর সব চরিত্রও বনফুলের অল্পবিস্তর পরিচিত ব্যক্তি। তাঁরা অনেকেই 'প্রবাসী' অথবা 'শনিবারের চিঠি' কাগজের সূত্রে একদা আড্ডা জমাতেন। বনফুলের অধিকাংশ গদ্য রচনাতে যেমন 'জঙ্গমে'ও তেমনি, বিচিত্র অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে আত্মসমীক্ষার প্রচেষ্টা।

অতঃপর বনফুল দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা ও অবস্থা নিয়ে উপন্যস্ত রচনা লেখেন। এ রকম ধরনের প্রথম উপন্যাস 'সপ্তর্ষি' (১৯৪৫)। এতে সুভাষবাবুর সঙ্গে গান্ধীবাদীদের অনৈক্যের কথা আছে। 'স্বপ্ন-সম্ভব' ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের নিদারুণ সংঘট্ট নিয়ে লেখা। বইটি বেরিয়ে ছিল পুস্তকাকারে ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন মাসে। যে মৈত্রী স্বপ্নে ছিল কিন্তু বাস্তবে যা বিপরীত গতি নিয়েছিল তা কীভাবে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল সেই চিত্রই আঁকা হয়েছে বইটিতে। বইটির কিছু ডকুমেন্টরি মূল্য আছে। সেই কারণে 'স্বপ্ন-সম্ভব' ইংরেজিতে অনূদিত এবং **Hindusthan Standard**-এর পূজা সংখ্যায় বার হয় **'Betwixt Dream and Reality'** (পুস্তক আকারে রূপা কোম্পানি কর্তৃক **'Dream and Reality'** নামে প্রকাশিত হয়।)

'অগ্নি'-র বিষয় হচ্ছে ১৯৪২ সালের কংগ্রেসের আন্দোলন যার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি গভর্নমেন্টের দলে চলে যায়। বইটি বার হয়েছিল ১৩৫৩ সালে।

তার পর 'মানদণ্ড' বার হয় প্রথমে পূজা সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৯৫৪ ?), পুস্তক আকারে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। এ কাহিনীটিতে রুশীয় সাম্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় গান্ধীবাদের তুলনা করে সাম্যবাদের—অর্থাৎ কমিউনিজমের—দুর্বলতা ও অনুপযোগিতা দেখানো হয়েছে। সাম্যবাদীদের মতে মানদণ্ড "বহু বিতর্কিত উপন্যাস"।

তার পর রোমান্সে ফিরে এলেন বনফুল। লিখলেন 'নবদিগন্ত' (প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৫৬)। পিতাপুত্র পরস্পর স্নেহশীল তবে বিরোধী স্বভাব। পুত্রের স্বভাব জেনেও পিতা নিজের দৃষ্টিতে তাকে চালনা করতে চান। এই দ্বন্দ্বে কাহিনীটি জমে উঠেছে। গুরুগাম্ভীর্য সত্ত্বেও কাহিনীটি সুখ-পাঠ্য। কাহিনীটি প্রথমে নাটকের আকারে রচিত হয়েছিল। শেষে উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়েছে তবে কাহিনীর চাপা-পড়া নাট্যরূপ মাঝে মাঝে মাথা তুলছে। তাতেই গল্পটির মাধুর্য বিশেষ ভাবে জমেছে। চিত্তদ্বন্দ্বে বনফুলের আত্মকথার ছাপ ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। তাঁর পিতা ডাক্তার ছিলেন, তিনিও ডাক্তারি পড়েছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি ডাক্তার হন নি। ডাক্তারির যে বৈজ্ঞানিক অংশ তিনি তারই চর্চা করে-ছিলেন জীবিকা রূপে। বনফুলের প্রকৃতি ছিল কবির অর্থাৎ ভাবুক লেখকের।

রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে উপদেশ দিয়েছিলেন প্রচুর বই পড়তে, রচনার বস্তুকণা সংগ্রহের জন্য। সেই উপদেশ অবলম্বনের একটা প্রত্যক্ষ ফল হল 'ডানা' উপন্যাসটি। তিন অধ্যায়ে অর্থাৎ খণ্ডে প্রকাশিত (১৯৪৮, ১৯৫০, ১৯৫১ ?)। যে বিশেষ অধ্যয়নের ফলে ডানা লেখা হল তা হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়, Ornithology, বাংলায় পক্ষিবিদ্যা।

শুধু অধ্যয়ন নয় প্রচুর পর্যবেক্ষণও করতে হয়েছিল বনফুলকে। এ বিষয়ে তাঁর উপদেষ্টা ও সহায়ক ছিলেন তাঁর বন্ধু প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত, বইটি এঁকেই উপহৃত হয়েছিল।

'ডানা' একটি রোমান্টিক কাহিনী। আঁকা হয়েছে পক্ষিবিদ্যাকীর্ণ চিত্রপটে একটি যেন পথভ্রষ্ট যাযাবর পাখির মানব প্রতীক মেয়েকে নিয়ে। যুদ্ধের ভয়ে বর্মা থেকে পলাতক সংসারের মধ্যে এই মেয়েটিই শুধু প্রাণ নিয়ে চলে আসতে পেরেছিল। এসে সে আশ্রয় পায় এক পক্ষি-বিদ্যার্থীর সহায়করূপে। ইনি অমরবাবু। এইসূত্রে মেয়েটি আরও দুজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে,— কবি আনন্দমোহন এবং সাংসারিক রূপচাঁদ। আনন্দমোহন আকৃষ্ট হয়েছিলেন কবিত্বের অভিযানে, রূপচাঁদ সাধারণ মানুষের মতো দৈহিক প্রেমের টানে। এঁরা তিন জনেই বিবাহিত। এদিকে বর্মায় থাকার সময়ে একটি ভালো ছেলের সঙ্গে— নাম ভাস্কর— মেয়েটির সম্বন্ধ হয়েছিল। তার কথা সে এখনও ভুলতে পারে নি। সেই কারণে তার মন কবি অথবা রূপচাঁদ কারো দিকে ঝুঁকে পড়ে নি, যদিও অন্তরে অন্তরে সে কিছু টান অনুভব করত। তার পরে মেয়েটির আলাপ হল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। এই উদাসীনের কথা ও কাজ মেয়েটিকে টানত কিন্তু সন্ন্যাসী তাকে কিছু আমল দিলেও প্রশ্রয় দিত না। মেয়েটি অমরবাবুর পক্ষিশালার চার্জ নিয়ে মেতে আছে। কবির পক্ষিবিষয়িনী কবিতায় সে নিজের ইঙ্গিত পেয়ে খুসিই আছে। কিন্তু মনের মধ্যে কাঁটা খচখচ করতে থাকে। তার পর ভাস্করের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে এসেছে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে। তখনও সে বিয়ে করে নি। তবে সে মদ্যাসক্ত হয়ে পড়েছে। এই দেখে তার সম্বন্ধে মেয়েটির মোহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী তাঁর সম্পত্তি— যেখানে মেয়েটি থাকে ও ব্যাঙ্কে জমা টাকা ও এক ঘড়া মোহর— যা তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি— সব মেয়েটির নামে লেখা-পড়া করে দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। তখন মেয়েটি নিজের পথ খুঁজে পেল। সে সন্ন্যাসীর কাছে পাওয়া সব সম্পত্তি অমরবাবু, আনন্দবাবু ও রূপচাঁদবাবুকে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে

গেল। তাকে দেখতে পেয়েছিলেন অমরবাবু মাস তিনেক পরে লছমনঝোলায়। সে গেরুয়াধারণ করে দীন বেশে রয়েছে। অনেক সন্ধান করেও অমরবাবু আর তার সন্ধান পেলেন না।

মেয়েটির নাম ডানা, বইটিরও নাম 'ডানা'। এই নামটি নিয়ে কিছু বলবার আছে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই তার বাবা মা রেখেছিলেন, সুতরাং বিশিষ্ট পক্ষি-অঙ্গের সঙ্গে নামটির সম্পর্ক নেই। কিন্তু বইটির বেলায় কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। পাখির উড়বার শক্তি তার ডানায়, সুতরাং এ নামটি নারীর স্বাধীন শক্তির সিম্বলরূপে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু বাপ মা মেয়ের অমন নাম রাখলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস মিলছে ডানার সন্ন্যাসীর দেওয়া মোহর-ঘড়ার প্রাপ্তিতে। গ্রীক-পুরাণ কাহিনীতে ডানা (**Danae**) ছিল পের্সেউসের (**Perseus**) মা, অক্রিসিউসের (**Acrisius**) নাতি পের্সেউসের জন্মদাতা জেউস্‌ যখন পিতাকর্তৃক বন্দিনী ডানার কাছে এসেছিল তখন স্বর্ণ বৃষ্টি হয়েছিল। কষ্ট-কল্পনা হলেও এ মিল এখানে উল্লেখযোগ্য।

কাহিনীতে মহাভারতের মতো এক নায়িকার পাঁচ নায়ক, এবং মহাভারতের মতো নায়িকা পাঁচজনের প্রেমিকা নন, তবে পাঁচজনেরই হৃদয় অধিকার করেছিলেন এবং পাঁচজনকেই পছন্দ করতেন। তবে তাঁর হৃদয় অধিকার করেছিলেন সন্ন্যাসী। তিনি যেন দিশাহারা যাযাবর পাখির দিশা।

কাহিনীর কল্পনায় কবিত্ব আছে। বইটির মধ্যেও কবিতা কম নেই।

অধ্যয়নলব্ধ বিষয় নিয়ে বনফুলের দ্বিতীয় উপন্যাস হল 'স্থাবর' (বৈশাখ ১৩৫৮)। এর আগে 'ডানা' রচনায় বনফুল যেমন নিজের পর্যবেক্ষণকেও কাজে লাগিয়েছিলেন গল্পের তাঁত বোনায়, 'স্থাবরে' তেমন পারেন নি। বিষয় সম্পূর্ণভাবে কল্পনা সৃষ্ট। 'জঙ্গম' রচনা করে বনফুল সমসাময়িক জীবনের ধারাবাহ চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাই বিষয় বস্তু হয়েছে। সে অভিজ্ঞতায় গল্পের সম্পূর্ণতা ছিল

না থাকবার কথাও নয়। 'স্থাবর' বইটিতে তিনি মানব জীবনের গোড়ার কথা আঁকতে চেষ্টা করেছেন। এ গোড়ার কথা ইতিহাসে মেলে না। প্রত্ন-ইতিহাস, নৃবিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাদি অনেক কিছু বিজ্ঞান চিন্তার ও যুক্তি ভাবনার যোগে কল্পিত হয়েছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে এ কল্পনার ফাঁক ততই বস্তু দিয়ে পূর্ণ করা হচ্ছে। কিন্তু আট দশ হাজার বছর আগেকার মানুষ জীবন সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? তারও আগে গেলে অনুমান ছাড়া কিছুই সম্বল থাকে না। প্রিমিটিভ মানুষের মনে পৌঁছাতে গেলে একটা পথ আছে। সেটাও কল্পনা পথ। কিন্তু সে পথের যে পথিক সে তো সেই প্রিমিটিভ মানুষেরই সন্তান। সুতরাং তার কল্পনায় তার আদিম পিতা মাতা পিতামহী মাতামহীদের ভাবনার আঁশ হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মাত্রায় তার মনের চিটের মধ্যে অবশ্যই লেগে আছে। সুতরাং গল্প রচনায় বনফুলকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। নৃবিদ্যার (ethnology) যে সাহায্যটুকু নিয়ে ছিলেন তা নিতান্তই ক্ষীণ। কতকগুলো সাধারণীকৃত স্থূল আবরণ মাত্র। বইটির প্রসঙ্গে বনফুল ভূমিকায় যা লিখেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

> মানবজাতির যে কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণরূপ এখন অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহারই প্রাথমিক পর্ব লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইল। স্থান কাল পাত্রের যে সীমাবদ্ধতা সাধারণ উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করে, এক্ষেত্রে তাহা নাই। কারণ যিনি এই উপন্যাসের বক্তা, বিশেষ কোন স্থান, কাল বা পাত্রে তিনি আবদ্ধ নহেন। যুগ-যুগান্তর বহু খণ্ডজীবনের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন। তাঁহারই স্মৃতি কথা এই উপন্যাস।
>
> এ আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু ইতিহাসে এ কল্পনার সমর্থন আছে। সন্ধানী পাঠক-পাঠিকারা বর্তমানের অতি আধুনিক প্রগতিশীল সভ্যসমাজেও হয়তো এ কল্পনার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করিবেন। বক্তাও মাঝে মাঝে সে ইঙ্গিত দিয়াছেন।

বনফুলের উক্তি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে 'স্থাবর' 'ডানা'-র মতো বিদ্যারস সিক্ত বই নয়।

'কষ্টিপাথর' (পুস্তক আকারে কার্তিক ১৩৫৮) উপন্যাসখানি কতকগুলির চিঠির সমষ্টি। বাংলা উপন্যাসে এ ব্যাপার একেবারে নূতন না হলেও বনফুলের এই রচনাটিতে বিশিষ্টতা কম নেই। নায়ক অসিতের চিঠিই বেশি। সেগুলির অধিকাংশ তার প্রায় সদ্যোবিবাহিত পত্নী হাসিকে লেখা। স্বামী-স্ত্রীর এই পত্রব্যবহারের মধ্যে বনফুলের নিজের বস্তু আছে। হাসির পত্র একখানি মাত্র। সে পত্র কাহিনীর উপসংহার রচনা করেছে। আরও চিঠি আছে,—অসিতের বন্ধুদের, তাঁদের এক জনের স্ত্রীর, অসিতের শ্বশুরের, তাঁর এক বন্ধুর। কাহিনী সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত হয়েছে যেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর-পত্র' গল্পটির সূত্র অনুসারে।

'কষ্টিপাথরে'র মধ্যে একটি দীর্ঘ গদ্য-কবিতা আছে— ছত্র সংখ্যা প্রায় পাঁচশ। কবিতাটি নায়ক নায়িকাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। এটি একটি পরিপূর্ণ গল্প। এতে ডাক্তার কবি খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের সোহিনীর ইঙ্গিত?—, সন্তানার্থিনী অথচ বিবাহ বিদ্বেষিণী কথিতা-নায়িকার গর্ভে টেষ্টটিউব বেবির জন্ম দিয়ে। এই অভিনব ডাক্তারি কবিতার একটু নমুনা দিই।

জ্বলে উঠল নিঃশব্দে
চারটে হাজার-ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের বাতি।
একটা আর্‌গট ইন্‌জে্‌কশন দেবার পর
শুরু হল অপারেশন।
করকর করে ছুরি বসল পেটের চামড়ায়,
ইউটেরাস দেখা গেল একটু পরেই,
সেটাকে
ভল্‌সেল্লাম দিয়ে ধরলেন বাগিয়ে সহকারীরা,
ছুরি বসালেন তাতে সার্জন।

ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটল,
সার্জেনের গাউনে এক পিচকিরি রঙ দিয়ে দিলে যেন কেউ,
কট কট কট—
আর্টারি ফরসেপ্‌স্ চেপে ধরল ছিন্ন শিরার মুখ
নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে কাজ চলতে লাগল।...

অতঃপর বনফুলের ছোটগল্পের আলোচনা কর্তব্য। এ বিষয়ে আমি অনেককাল আগেই— তাঁর গল্প সংগ্রহের তৃতীয় শতকের ভূমিকার— আলোচনা করেছি বলে এখানে দুচার কথা বলেই সারছি।

সংস্কৃতে একটি উক্তি আছে;

কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে। এই উক্তির অনুকরণ করে বলা যায় যে আধুনিক কালে কথয়া (অর্থাৎ, উপন্যাসেন) হন্যতে কাব্যং (অর্থাৎ মহাকাব্যং) কথাগল্পেন (অর্থাৎ ক্ষুদ্রগল্পেন) হন্যতে। উপন্যাসের আবির্ভাবে মহাকাব্যের তিরোধান ঘটেছে, আর ছোট গল্পের আবির্ভাবে উপন্যাসের তিরোধান ঘটতে শুরু হয়েছে।

আমার এই কথার শেষ অংশে বোধ করি আপত্তি উঠবে। কেন উপন্যাস তো অজস্র বেরুচ্ছে, এবং গল্পের বইয়ের কাটতির তুলনায় উপন্যাসের বিক্রি তো অনেক বেশী। তা হলে ছোট গল্পের দ্বারা উপন্যাস মার খেয়েছে বা খাচ্ছে এ কথা বলা কি সঙ্গত ?

এ আপত্তির উত্তরে বলব যে ছোট গল্পের আবির্ভাবের পর থেকে উপন্যাসের ধাঁচা পালটে গিয়েছে। এখনকার উপন্যাস আর টানা কাহিনীর রামায়ন নয়, তবে টুকরো কাহিনীর মহাভারত হতে পারে। এখনকার উপন্যাস হচ্ছে ছোট গল্পের কুঁড়ির গড়েমালা। আধুনিক উপন্যাসের আকর্ষণ তার এই টুকরো টুকরো গল্পত্ব আকর্ষণের জন্যেই।

বনফুলের রচনা চিত্রধর্মী, সুতরাং তাঁর রচনাবলীর সাহিত্য-উপাধানের ধর্মই— তা সে নাটক বা উপন্যাস থেকে হোক— গল্পত্ব। সুতরাং ছোট গল্প রচনায় তাঁর কৃতিত্বের প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

যে চিত্র ছোট গল্পের উপাদান তা প্রধানত দু'জাতের— পোট্রেট অর্থাৎ ছবি, আর ক্লোজ্-আপ্ অর্থাৎ চেহারা। পোট্রেট ভাবিয়ে তোলে, ক্লোজ্আপ্ চমক দেয়। বনফুলের অসাধারণ দক্ষতা ক্লোজ্-আপে।

বিশ্বসাহিত্যে ছোট গল্পের ক্লোজ্-আপ্ টেকনিকে সব চেয়ে দক্ষ লেখক বোধ করি আইরিশ-আমেরিকান ও-হেন্‌রি। বনফুলের অনেক ছোট গল্পে আমি ও-হেন্‌রির কলমের আঁচড় লক্ষ্য করেছি।

সাহিত্য-সংসারে ছোট গল্প নবজাতক। নবজাতকের আদর ও অনাদর দুই-ই তার ভাগ্যে ঘটেছে। আদর তার বিচিত্র লীলায় মনো-হরণের জন্যে, অনাদর তার ক্ষণিকতার ও অভাবনীয়তার জন্যে। আসলে কিন্তু দুই-ই এক কথা। শিশুর মনোহারিতা তার ক্ষণলীলায়, তার হাসি-অশ্রুতে, রৌদ্রমেঘের খেলায়। কিন্তু পরিপক্ব প্রবীণ জানেন যে ছেলে-খেলা নিয়ে থাকলে সময় কাটে ভালো তবে সংসার চলে না। তাই এখন সাহিত্য-সংসার চালাচ্ছে উপন্যাস। বিচক্ষণ পাঠক এখানে আপত্তি তুলতে পারেন, তাহলে কবিতা-নাটক করছে কি? কবিতা আছে বুড়ো কর্তা হয়ে, খাতির খুব কিন্তু চাকরি করেন না, পেনসনও নেই। ঘরসংসারের কাজে লাগেন না তবে ঘাঁটি আগলে আছেন। আর নাটক? সে তো ভাড়াটে কর্মচারী, দৈবাৎ দেখা দেন, প্রায়ই অনুপস্থিত।

সাহিত্য-সংসারে ছোট গল্প নবজাতক বটে। সে সবার ছোট বলেই নবজাতক। নইলে সে বুড়ো কর্তার চেয়েও বড়। সে সাহিত্য-সংসারের পূর্বতম পুরুষ, নতুন জন্ম নিয়ে এসেছে। সাহিত্য-সংসারের ছাপা কুলজি ফর্দে তার নাম নেই, অথচ এমন দিন ছিল না যে সে কোনো-না-কোনো রূপে নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, সাহিত্যের প্রথম ফসল কবিতা। তাঁরা জানেন না যে "সাহিত্য" হিসাবে গল্পের বীজ কবিতারও আগে দেখা দিয়েছিল। গোড়ায় গোড়ায় কবিতা ছিল মন্ত্রের সামিল, দেবতা ও পুরুতের যোগসূত্র, মানুষের সংসারে ব্যবহারের কোন কথাই তখন ছিল না। সে মন্ত্র-কবিতা শুনলে মানুষের লাগত ভয়, জাগত মোহ। সে কবিতা-মন্ত্রের আনন্দময় গার্হস্থ্য প্রতিরূপও ছিল— ছেলে ভুলানো ছড়া। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখন সে ছড়ায় অর্থের দানা বাঁধেনি, সে শুধুই সুরে গাঁথা শব্দসমষ্টি।

খাঁটি কথা হল এই যে মানুষ যখনই পরস্পর কথা চালাচালি করতে সমর্থ হল তখন থেকেই গল্পের আরম্ভ। সে গল্প হল নিছক নিষ্প্রয়োজনের, —তার ব্যবহার সময় কাটাবার জন্যে, ঔৎসুক্য জাগাবার জন্যে। কিন্তু এমন বাগ্‌বস্তুকে স্থায়ী রূপ দেবার চিন্তা যুগ যুগ যাবৎ কেউ স্বপ্নেও করে নি। নিরর্থক মন্ত্র থেকে সমর্থ ছড়া, তার থেকে সুঠাম পদ্য, তার থেকে মনোহর কবিতা, সে কবিতার বিচিত্র রূপ— এমনি করে পায়ে-পায়ে মানব-সাহিত্য এগিয়ে চলল, তারপর দৌড় দিলে। আর গল্পও চলল সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্তরালে, বেগার চাকর হয়ে।

সংস্কৃতের একান্নবর্তী সংসার ভেঙে গিয়ে ভারতীয় সাহিত্য যখন বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা অবলম্বন করে নূতন নূতন ভাবে মেতে উঠে নূতন নূতন সংসার পাতলে, তখন দেখা গেল যে বেগার চাকরটি না হলে কারো চলছে না। তখন থেকে সাহিত্য-সংসারের প্রকাশ্য পরিজনের তালিকায় তার নাম উঠল। কোন সংসারে তার নাম হল 'জাতক', কোন সংসারে 'অবদান', কোন সংসারে 'কথা'। সেকালে সাহিত্য-সংসার চলত ধর্মের কারবারে। ধর্মের ভারী ভারী মাল সব গল্পভৃত্যই বইতে লাগল। কালক্রমে— কালক্রমটি কম নয়, হাজার খানেকেরও বেশি বছর হবে— তার কিছু স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ঘটল। ধর্মের ভার বহন থেকে সে মাঝে মাঝে ছাড়া পেতে লাগল গল্পের জন্যেই গল্প লেখা হল। তবে সে কদাচিৎ। ধর্মের বোঝা হাল্‌কা হলে পর গল্পের উপর চাপল নীতির বোঝা। নীতির বোঝা ধর্মের মতো নিরেট ভারি নয়। সে বোঝা এমনি হাল্‌কা, তাকে আরও হাল্‌কা করা শক্ত নয়, অনীতি এমন কি দুর্নীতিও চালানো যায়। ভারতীয় সাহিত্যে গল্পের মুক্তি এই দিক দিয়েই ঘটেছিল। ধর্মকথা থেকে নীতিকথায় এসে গল্প হাঁফ ছাড়লে। নীতিকথা থেকে পরিহাস কথায় এসে তার দাম বাড়ল। তখন সাহিত্য-কর্ম ছিল পণ্ডিতের হাতে। শাস্ত্রশাসন ও নীতিকথন তাঁরা করতেনই, তবে সাধারণ মানুষের মতো খোশগল্পও করতেন। সে খোশগল্পের রস সর্বদা অনাবিল ছিল না, অধিকাংশ হয়ত এখনকার দিনের উপযুক্ত নয়।

তবে কোন কোন গল্পের উপভোগ্যতা এখনও আছে। বিশেষ করে কালিদাসকে পাত্র করে গড়া গল্পগুলি। এগুলি নিতান্তই সেদিনের সাহিত্যের ক্ষুদ্রতম খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে ছোটগল্প আমদানি করলেন। তার আগে ছিল গল্প— সাহিত্যে নয়, লোকব্যবহারে। সে গল্প ছিল দু'রকমের— খোশগল্প আর রূপকথা। এই দু'রকমের গল্পের সাহিত্য-মূল্য, বিশেষ করে রূপকথার— রবীন্দ্রনাথই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং নিজেও লিখে এদের জাতে তুলে দিয়েছেন। তবে তাঁর স্বসৃষ্ট ছোটগল্প যেমন সমাদৃত ও পরিশীলিত হয়েছে রূপকথা ও খোশগল্প তেমন কেন প্রায় কিছুই হয় নি। তার অবশ্য কারণ আছে।

বনফুলের গল্পের পরিচয় দিতে গিয়ে উপরোক্ত দীর্ঘ ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রয়োজন সম্বন্ধে পাঠকের মনে সংশয় হতে পারে। উত্তরে একটু ধৈর্য ধরতে বলি।

বনফুলের গল্প পড়তে আমার ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে সেই কথাটুকু বলতে চাইছি। বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভালো গল্প লিখেছেন ও লেখেন এমন সাহিত্যিকের খুব অভাব নেই। তাঁদের অনেকেরই গল্পে নিজস্বতা আছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে বাংলা ছোটগল্পে সুস্বাদের ও সুবাসের বৈচিত্র্য কম। তাঁদের কেউ কেউ জলের মতো ঘুরে ঘুরে অথবা দক্ষিণ হাওয়ার মতো ফিরে ফিরে চমৎকার-ভাবে একই কথা কন। সেই এক কথার একতারা-দোতারাতেই তাঁদের বিশেষ মহিমা। বনফুলের গল্পে একতারা-দোতারা বাজে নি, বেজেছে বহুস্বর কলকণ্ঠ। লেখকের মনের তার যে কোথাও গুঞ্জন তোলেনি তা বলছি না, বলছি এই যে সে গুঞ্জন গল্পের নরনারীর হৃৎস্পন্দনের তালে তালে মিলে গেছে। এমনি বনফুলের সিম্প্যাথি।

বনফুলের গল্পে কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে, যে জীবন বহু-বিচিত্র বহু-বিসর্পিত। নিজের দৃষ্টি, নিজের অনুভব কল্পনার তাঁতে আত্মভাবনার জাল বুনে বুনে তাঁর গল্প গড়া নয়।

এঁর গল্প প্রচণ্ড, হয়তো স্থানে স্থানে মোলায়েম নয়, কিন্তু সর্বদা হৃদ্য এবং পরিতৃপ্তিকর। বনফুলের গল্পে যে-সব নরনারী উপস্থাপিত হয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতার ভূমিতে হয়ত তাদের কেউই কখনো দেখা দেয় নি, অথচ মনে হয় তারা যেন অপরিচিত নয়, তাদের মতো কাউকে যেন কোথাও দেখে থাকব, তাদের কথা শুনে থাকব। বনফুলের লেখনীর বলিষ্ঠতার পরিচয় এখানে। বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটেছে—ফোটোগ্রাফ ওঠে নি। এও তাঁর গল্পের এক বিশিষ্টতা। বহুদিন পূর্বে প্রভাতকুমারের গল্পে এই রকম আস্বাদ কিছু পাওয়া গিয়েছিল। তবে প্রভাতবাবুর গল্পের ছবিতে খুশির উজ্জ্বল আলো পড়েছে, বনফুলের গল্পে খুশি-অখুশির আলোছায়ার আলপনা আঁকা হয়েছে।

বিশেষ করে বলতে চাই আর একটা কথা। বনফুল তাঁর গল্পে—ছোটগল্পে ও ছোট ছোট গল্পে— বহু এবং বিচিত্র রস সঞ্চারিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে মজলিশি গল্পকে আধুনিক সাহিত্যের শ্রেণীতে তুলে দিয়েছেন। এ কাজ যে আর কোন গল্প লেখক কখনো করেন নি তা নয়। তবে বনফুল এ কাজ করে এসেছেন প্রচুর এবং অনায়াসে। বাংলা গল্পে বনফুল যে নব নব রস জমিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যাকে নাম দিতে পারি "ডাক্তারি রস"। এ রস সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণভাবে ফুটেছে তাঁর তৃতীয় সংগ্রহের প্রথম গল্পটিতে (দাবি গল্পটিতে)। আশংকা হচ্ছে অনেকে হয়ত গল্পটির মর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না। তবুও গল্পটিকে প্রথম স্থান দেওয়া অনুচিত হয় নি। আর একটি গল্পকে যদিও এটা ঠিক গল্প নয়, আনুষ্ঠানিক ছোটগল্প তো নয়ই, প্রথম স্থান দেওয়া যেতে পারত— 'সাঁতারের পোশাক'। ইংরেজ দোকান-ম্যানেজার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পয়সা বাকি রেখে সাঁতারের ভালো পোশাক দিয়ে দিলেন, বাঙালী দোকানদার গরজ দেখিয়ে খারাপ পোশাক দিয়ে শেষ পর্যন্ত দাম নিলেন না ; শেষে সিদ্ধপুরুষ বেংকট বাবা যিনি মন্তরের চোটে সবকিছু যখন খুশি আনিয়ে দিতে পারেন, তাঁর কাছে সুইমিং কস্টুম চাওয়া হলে তিনি যে জবাব দিলেন তাতেই গল্পের নির্যাস ঘনীভূত।

"সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, সাঁতার কাটবার জন্যে আবার পোশাকের দরকার কি? বাবা, সমস্ত ত্যাগ করে' ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোশাক নিয়ে কি হবে'। —"

বনফুলের গল্পের যে বিশিষ্টতাটি বুঝতে দেরি হয় না সে হল গল্পের অনপেক্ষিত অথচ সুসঙ্গত সমাপন। এই বিষয়ে এবং বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ করণে বনফুলের সঙ্গে ও-হেনরিরই তুলনা মনে আসে। যেমন, 'চুনোপুঁটি', 'ঋণশোধ',' চম্পামিশির,' 'যোগেন পণ্ডিত', 'যুগল-যাত্রা', 'টিয়া-চন্দনা', ইত্যাদি ইত্যাদি। ও-হেনরির রচনা সবই পড়া না থাকলে আমি কিছুতেই ভাবতে পারতুম না যে বনফুলের 'শিল্পী' ও-হেনরির কোন গল্পের ছায়াবলম্বনে লেখা নয়।

আর বেশি বলা নয়। রসজ্ঞ গল্পপ্রিয় পাঠককে এই আহ্বান জানিয়ে শেষ করলুম—স্বাগতং ভো মহদ্ ভোজ্যং বঃ সমুপস্থিতম্।

নির্ঘণ্ট

